সোভিয়েটের মেয়েরা

কল্যাণী রায়

সোভিয়েটের মেয়েরা

সোভিয়েটের মেয়েরা

কল্যাণী রায়

★

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড
কলিকাতা — ১২

তৃতীয় সংস্করণ
আগস্ট, ১৯৫২

প্রকাশক—সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্ লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড্
কলিকাতা—১৩

দাম দেড় টাকা

সমাজে মেয়েদের স্থান

পৃথিবীর ইতিহাসের গোড়া থেকে—যবে থেকে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ—মেয়েরা সমাজে নিকৃষ্ট আসন পেয়ে আসছে। মার্কসবাদী দার্শনিক ফ্রেড্রিক এঙ্গেল্স্-এর মতে শ্রেণী সমাজের উৎপত্তির পর থেকেই মেয়েদের পরনির্ভরশীলতার সূচনা। এই শ্রেণী সমাজই তার বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম সামাজিক অসাম্য ও অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসে সর্বপ্রথম শ্রেণী-অন্তর্দ্বন্দ্ব পুরুষ ও নারীর বিবাহের দ্বন্দ্ব এবং সর্বপ্রথম শ্রেণী শাসন নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিপীড়িত শ্রেণীর মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় অনেক হীন ও নিকৃষ্ট বলে প্রচারিত হওয়া ছাড়াও তারা প্রথমে ক্রীতদাসী, তারপরে বাঁদী এবং সর্বশেষে শ্রমজীবী হিসাবে পুঁজিপতিদের কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রাচীন যুগের দাস-সমাজ থেকে শুরু করে আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজ পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর ভদ্রলোকরা তাদের নিজেদের স্বার্থের প্রতি পুরোপুরি নজর রেখে বলে আসছেন যে চলতি শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা হ্ল অত্যন্ত 'ন্যায়সঙ্গত', 'সমীচীন' ও 'স্বাভাবিক'। তারা বার বার 'প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম'-এর কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। এই নিয়মের বলেই নাকি কিছু লোক ধনী হয় আর বাকীরা হয় নির্ধন; কিছু লোক শাসন করে আর বাকীরা হয় শাসিত। এই জাতীয় যুক্তির জোরেই শাসকশ্রেণীর ভদ্রলোকরা এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির বৈষম্য আর এক জাতির দ্বারা অপর জাতির শোষণের অনিবার্যতার কথা বলে আসছেন। তাদের মতে প্রকৃতিই নাকি এই সমস্ত রকম শোষণের জন্যে দায়ী। শ্রেণী সমাজের আদ্যোপান্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে মেয়েরা স্বাভাবিক কারণেই পুরুষদের মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী হতে পারে না—মেয়েদের সম্পর্কে এই নির্লজ্জ নিকৃষ্ট ধারণা আগা-

গোড়াই প্রবল হয়ে থেকেছে। বিখ্যাত কথাশিল্পী মাক্সিম গোর্কী বলেছেন যে গত দু-হাজার বছর ধরে গির্জা এবং রাষ্ট্র মেয়েদের মধ্যে কেবল এই মূঢ় বিশ্বাসই সঞ্চারিত করেছে যে তারা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের মনকে বিষাক্ত করেছে। আর তারই ফলে মেয়েরা সর্বদাই নিকৃষ্ট জীব বলে গণ্য হয়েছে।

শাসক শ্রেণীর ভদ্রলোকরা রাশি রাশি বই লিখে এই কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে যেহেতু মেয়েরা পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট সেই হেতু মেয়েদের শাসন করার অধিকার পুরুষের আছে। যেহেতু শারীরিক ও অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল সেই হেতু পুরুষরাই নারীর শাসনকর্তা। এই ভ্রান্ত প্রচার মেয়েদের মধ্যে দাসসুলভ চিন্তার সঞ্চার করেছে। শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ভদ্রলোকরা সগর্বে বলে থাকেন যে, বিধাতাই মেয়েদের নিকৃষ্ট করে সৃষ্টি করেছে, পুরুষের অধীন করে রেখেছে, বৃহত্তর সামাজিক কাজকর্মের অনুপযুক্ত করে গড়েছে—কাজেই তাদের সমস্ত কিছুই সংসারধর্ম, রান্নাঘর ও গির্জা বা ধর্মকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা প্রমাণ করেছে যে, প্রতিক্রিয়াশীল ভদ্রলোকদের এই সমস্ত কথাবার্তা কেবল পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখার মিথ্যা অজুহাত মাত্র, এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। বিশ কোটি মানুষের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নে সাম্যবাদ কী বিস্ময়করভাবে নারীমুক্তির প্রতিষ্ঠা করেছে তার রোমাঞ্চকর কাহিনী এই বইখানিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে।

মেয়েদের অধিকার

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মেয়েরা হল জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ। এই অংশকে বাদ দিয়ে কোন মুক্তি-আন্দোলন বা নতুন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে না, যে-কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসেই তার প্রমাণ মিলবে। দুশো বছর-ব্যাপী বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের রক্তাক্ত পৃষ্ঠায়ও তার স্বাক্ষর রয়েছে। নিদারুণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও অবমাননার মধ্যে দিয়েই এ দেশের মেয়েদেরও চৈতন্যপ্রাপ্তি ঘটেছে এবং নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে। নানা কুসংস্কার কাটিয়ে, নানা সামাজিক শাসন-অনুশাসন পেরিয়ে, নানা কৃত্রিম আবরুর বাধা উত্তীর্ণ হয়ে ঠিক এমনিভাবেই দুঃসাহসের সঙ্গে একদিন এগিয়ে এসেছিল জার-শাসিত রাশিয়ার লাঞ্ছিত মেয়েরা।

প্রায় আমাদের ভারতবর্ষের মতই ছিল একদিন রাশিয়ার অবস্থা। জারের অপ্রতিহত শাসন, সামন্তযুগীয় সমাজব্যবস্থা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অভাব, মুক্তি-আন্দোলনের নিষ্পেষণ আর ঘরে ঘরে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকার-সমস্যা ও মৃত্যুর পরোয়ানা। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা ছিল জমিদারের কেনা সম্পত্তি, ঋণের চাপে ছিন্নভিন্ন ছিল তাদের জীবনযাত্রা। পেটের রুটি আর পরনের কাপড় সংগ্রহ করতেই তাদের জীবনের অবসান ঘটতো। শ্রমিকদের অবস্থাও প্রায় একই রকম। অমানুষিক খাটুনির বিনিময়ে তাদের কপালে যা জুটতো তাতে আর যাই হোক কোন রকমে খেয়ে পরে বাঁচা চলতো না। এমনি শোচনীয় ছিল রুশ-সাম্রাজ্যে প্রজাদের অবস্থা। এবং এরই মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হচ্ছিল, অগ্রসর হচ্ছিল জাতীয় আন্দোলনের স্রোত। ঘরে ঘরে সংগঠিত হচ্ছিল চাষী মজুর ও সর্বশ্রেণীর মানুষ,—ধূমায়িত হয়ে উঠছিল বিক্ষোভের বহ্নি। সোভিয়েট বিপ্লবের প্রধান সংগঠক ও পরিচালক নিকোলাই লেনিন ও জোসেফ স্তালিন মেয়েদের সমস্যা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন

ছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, কোন দেশই তার অর্ধেক জনসংখ্যাকে রন্ধনশালায় বন্দী রেখে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে মেয়েদের জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে তাঁদের চিন্তা করতে হতো। বর্তমানের সোভিয়েট দেশের যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে, লেনিন ও স্তালিন জানতেন যে এই আদর্শকে যদি তার সঠিক লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হয় তাহলে মেয়েদের ওপর কেবল পুরুষের নির্বাধ শোষণই নয়, তাদের ওপর থেকে সামাজিক রাষ্ট্রিক সব রকম শোষণ ও বৈষম্যমূলক ব্যবহারেরই অবসান ঘটাতে হবে। তাদের দিতে হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে যত রকম সামাজিক অসাম্য ও অন্যায় মাথা উঁচিয়ে রয়েছে তাদেরও ঘা দিতে হবে শেষবারের মত। শতাব্দী-ব্যাপী অচলায়তনের বিরুদ্ধে এমনি দৃঢ়তার সঙ্গেই সেদিন এগিয়ে এসেছিল লেনিন-স্তালিনের বিপ্লবী নীতি। ১৯১৭ সালের পরবর্তী যুগে সোভিয়েট দেশে যে সব আইন তৈরী হয়েছে ও তার ফলে নারীজাতির যে অভাবিত কল্যাণ সাধিত হয়েছে তাতে তার কার্যকারিতার প্রমাণই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জারের রাশিয়ায় মেয়েরা সমস্ত রকম রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। স্বামীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল আরও অপমানজনক। স্ত্রীরা ছিল স্বামীর কেনা বাঁদী। বিবাহিতা মেয়েদের পথে বেরোনোর কোন স্বাধীনতা ছিল না। স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে যে কোন লোকের কাছে বিক্রী করতে পারতো—তাতে তার কোন আপত্তি করা চলত না। এমনিভাবে একজন বিবাহিতা মেয়ে যে ক-বার হাত বদল হতো তার ঠিক নেই। কারণ সে ছিল পুরুষের কেনা সম্পত্তি। মেয়েরা ইচ্ছা করলেও আদালত থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি সহজে পেত না। যারা পেত তাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হতো; খোলা আদালতের সামনে খুলে বলতে হতো তাদের জীবনের সমস্ত কাহিনী। ফলে অধিকাংশ মেয়েই এই অমর্যাদা মাথা পেতে নিতে সাহসী হত না। আর তাছাড়া গরীব মেয়েদের সামর্থ্যও ছিল না আদালতের খরচ জোগাবার।

সে যুগে বর-কনেকে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করতে হতো কারণ তাই ছিল তখনকার নিয়ম। সন্তানের ওপর বাপের ছিল সর্বপ্রথম অধিকার। অবিশ্যি অবৈধ সন্তানের বেলায় মাকেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতো; সে ক্ষেত্রে আদালতের কোন রকম সাহায্যই মিলতো না।

সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবার পর এই সমস্ত আইনকানুন উচ্ছেদ করে নতুন নিয়মকানুন গঠন করা হল। এবং এই নিয়মে বিবাহ বা পরিবারগত সমস্ত ব্যাপারে মেয়েরা পেল পুরুষের সমান অধিকার। সুস্থ ও সবল সমাজ গড়তে হলে সবার আগে দরকার মানুষের পরিবারগত জীবনকে দৃঢ়ভাবে নতুন আদর্শে সংগঠিত করা—সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়করা বুঝেছিলেন এর গুরুত্ব এবং সেই ভাবেই অগ্রসর হয়েছিলেন নরনারীর জীবনকে সমানাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে।

সোভিয়েট সমাজে বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে এই নীতিই সর্বপ্রধান! আগে স্বামীই ছিল পরিবারের কর্তা, তার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করতো পরিবারের ভালো-মন্দ, কিন্তু নতুন শাসনব্যবস্থায় স্বামীত্বের পুরনো সামন্তযুগীয় সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। বিয়ের পর স্বামীর পদবী গ্রহণ করার ব্যাপারেও মেয়েদের কোন বাধ্যবাধকতা থাকল না। স্বামীর পদবী গ্রহণ করা না করা সম্পূর্ণই তার ইচ্ছাধীন। স্বামী এবং স্ত্রী তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পেশা বা কাজ গ্রহণ করার স্বাধীনতা পেল। বিয়ের সময়ে তারা যদি কোন কিছু লাভ করে তাতে তাদের দুজনেরই সমান অধিকার। বিয়ের আগে যদি দুজনেরই সামান্য কিছু সম্পত্তি থেকে থাকে তার মালিকানা যৌথ নয় সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েট দেশের মেয়ে পুরুষ কোন স্বার্থের খাতিরে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, যৌতুকের প্রলোভনে আজ আর কারো প্রলুব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজ স্ত্রী পুরুষ স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশন আপিসে গিয়ে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে বিয়ে করতে পারে। তার জন্যে কোন ধর্মানুষ্ঠান বা রাজকীয় আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাই বলে গির্জার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। বর-বৌ বা তাদের বাপ-মারা ইচ্ছে করলেই সেখানে গিয়ে ঘটা করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে। আগে গির্জায় মেয়েদের

জন্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ও পশ্চাৎবর্তী জায়গা সংরক্ষিত থাকত, আজ সে বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়েছে। আগে বিয়ের সময়ে পুরুষেরা পরতো সোনার আংটি, মেয়েরা পরতো লোহার। এই ছিল সেদিনকার নিয়ম! আজ কিন্তু সে সব নিয়মকানুনও চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

বর্তমানে সোভিয়েট ব্যবস্থায় বিবাহ এবং বিচ্ছেদ দু-পক্ষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তার ওপর রাষ্ট্রের অনুশাসনের কোন চোখ রাঙানি নেই। সেখানে সমতা ও স্বাধীন ইচ্ছার বনিয়াদের ওপর সুস্থ ও সবল পরিবার গড়ে উঠেছে নতুন ইমারতের মত। তবে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সোভিয়েট-কর্তৃপক্ষ বিবাহের ব্যাপারে লঘু-চিত্ততার প্রশ্রয় দিয়েছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল যে, সোভিয়েট আইন অনুসারে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর আগে কেউ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে না। এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ কমানোর জন্যে প্রত্যেকবার বিবাহ-বিচ্ছেদের ওপর ক্রম-বৃদ্ধিহারে সরকারী কর আদায় করা হয় যেমন প্রথমবার ৫০ রুবল,* দ্বিতীয়বার ১৫০ রুবল এবং তৃতীয়বার ৩০০ রুবল। ফলে কেউ অকারণে বা সামান্য কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদে সাহসী হয় না।

সন্তান-পালনের সমস্ত দায়িত্ব ও খরচ সমানভাবে বাপ ও মার ওপর পড়ে। যদি কোন দায়িত্বহীন লোক তার পরিবারের গুরুভার গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়—সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র তাকে সন্তান-পালনের খরচের এক অংশ দিতে বাধ্য করে।† যতদিন সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই অর্থদান আবশ্যিক। বৈধ, অবৈধ সমস্ত সন্তানের ক্ষেত্রেই একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। খোরপোষ অনাদায়ে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। শুধু তাই নয়, জনসাধারণের সামনে খোলা-খুলিভাবে তার কীর্তিকলাপ জাহির করে কঠোর সমালোচনা করা হয়; দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকায়ও এর বিরুদ্ধে নিয়মিত আন্দোলন চলে। যদি কখন দেখা যায় যে বিচ্ছেদের পর স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ

* এক রুবল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় এক টাকা দশ আনা।

† বর্তমান আইন অনুসারে কোন কোন লোককে উপার্জনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ দিতেও হতে পারে।

অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে তখন যে কর্মক্ষম সেই অপর পক্ষের জীবনধারণের ব্যয় বহন করে।

এই স্ত্রী-স্বাধীনতা শুধু যে পারিবারিক জীবনে বর্তমান তাই নয়, রাজনীতির বিস্তৃত ক্ষেত্রেও গিয়ে পৌঁচেছে এর ব্যাপ্তি। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যতদিন না পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে অগ্রসর হতে পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সমাজ-গঠনের পথে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবেই। তাই সোভিয়েট আইনে আঠারো বছরের যে কোন যুবতী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটের যে কোন পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও তার পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। কিন্তু জারের আমলে এই অমূল্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল সমগ্র স্ত্রীজাতি।

জারের শাসনে মেয়েরা ছিল পুরুষের মুখাপেক্ষী। অর্থোপায়ের চাবিকাঠি ছিল পুরুষের হাতে। তারাই রোজগার করে আনতো এবং সেই অর্থের ওপরই নির্ভর করত মেয়েদের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ। আজ সেই পুরনো নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে। মেয়েরা পেয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

জারের রাজত্বে আইন জারী করে সরকারী ও বেসরকারী আপিসে মেয়েদের চাকুরী করার পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, নির্যাতিত মেয়েরা এসে কাজ নিয়েছে কলকারখানায়, যৌথ কৃষিশালায়, সরকারী আপিসে ও নানা জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে। অশিক্ষা আর কুসংস্কারের জীর্ণ বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে এসে তারা পা বাড়িয়েছে নতুন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎকর্ষের পথে।

দলে দলে কারখানায় যোগ দিয়ে মেয়েরা সত্যিকারের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। পরমুখাপেক্ষিতার প্রশ্ন আজ তাদের কাছে নেই। রন্ধনশালার দেওয়ালের অন্ধকার আশ্রয় থেকে সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা তাদের সত্যিকার মুক্তি দিয়েছে। কারণ লেনিন জানতেন "কোন জাতি তার অর্ধেক জনসংখ্যাকে রন্ধনশালায় আটক রেখে প্রকৃত মুক্তি পেতে পারে না।" তাই শহরে ও গ্রামে হাজার হাজার সাধারণ ভোজনাগার আজ লক্ষ লক্ষ সোভিয়েটবাসীকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়েছে। তাতে

শুধু যে মেয়েরাই সুবিধা লাভ করেছে তাই নয়, সমগ্র দেশ এই বিরাট জনসংখ্যাকে রন্ধনশালা থেকে মুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হতে পেরেছে।

যে সব মেয়েরা কলকারখানায় কাজ করে তাদের ওপর রাষ্ট্র ও শ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা মেয়েদের স্বাস্থ্যের ওপর। কলকারখানায় প্রায় পঞ্চাশ রকম কাজ করা মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ কারণ সেই সব কাজের ফলে তাদের শারীরিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী নয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রের ও কলকব্জার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উঠে যাচ্ছেও। সোভিয়েট দেশে বৈজ্ঞানিকরা দলবদ্ধভাবে গবেষণা করে এবং তাদের গবেষণার ফলে যে কাজ করা মেয়েদের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়, সে কাজ মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৩১ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, আধ মণের (বিশ কিলোগ্রাম) বেশী ওজন্ বহন করা মেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। সেই বছরেই মেয়েদের জন্যে আধ মণের বেশী বোঝা বহন করা বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়।

প্রত্যেক কারখানায় স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা পরিদর্শন করার জন্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক আছে যারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক সমস্ত সুবিধে অসুবিধে পরীক্ষা করে দেখে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাছাড়া সোভিয়েট শ্রমিকদের, বিশেষ করে মেয়ে-শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায় হল 'শ্রমিক আইন' ও সামাজিক বীমাব্যবস্থা। সোভিয়েটে কোন কারখানায় সাত ঘণ্টার বেশী কাজ করা আইনবিরুদ্ধ; এমন কি পরিশ্রমবহুল কাজে ছয় ঘণ্টার বেশী কাজ করা বে-আইনী। প্রত্যেক মেয়ে-শ্রমিকই পুরুষের সমান মাইনে পায় এবং বছরে অন্তত দু সপ্তাহ করে ছুটি পায়। এ ছাড়া কাজ বিশেষে আরও ছুটির ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েট মেয়ে-শ্রমিকদের কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে জীবনপাত করতে হয় না। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য ও অবসরের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী তাদের জীবন।

সোভিয়েট বীমাব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্যে এক নতুন স্বর্গের দ্বার খুলে

দিয়েছে। অসুস্থতায়, দুর্ঘটনায় বা চিরস্থায়ী পঙ্গুতায় এই বীমা-ব্যবস্থাই শ্রমিকদের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। গর্ভাবস্থার আগে এবং পরে মেয়েদের এই বীমা ভান্ডার থেকেই অর্থ সাহায্য করা হয়। অন্যান্য দেশের মত শ্রমিকদের মাইনে থেকে একাংশ কেটে নিয়ে এই বীমা-ভান্ডার তৈরী হয় না। সোভিয়েট শ্রমিকরা এক পয়সা দিয়েও এই বীমা-ব্যবস্থাকে পুষ্ট করে না। কারখানা-কমিটিই কারখানার অর্থ দিয়ে এই ভান্ডার গঠন করে। কোন শ্রমিক মারা গেলে এই বীমা ভান্ডার থেকে তার পরিবারকে অর্থদান করা হয়, মৃতদেহ সৎকারের জন্যে সাহায্য দেওয়া হয়, নতুন সন্তান জন্মাবার পর মায়েদের প্রতি মাসে সন্তান-পালনের জন্যে অর্থদান করা হয়। শুধু তাই নয়, এই ভান্ডারের তরফ থেকেই সমস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারেরা বিনামূল্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রামাবাসে থাকার সুবিধে পেয়ে থাকে। ১৯৩৫ সালে সমস্ত সোভিয়েট দেশে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ রুবলের ওপর অর্থ এই বীমা-ব্যবস্থার জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। যারা এই ভান্ডারের অর্থে নানা স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রামাবাসে অবস্থান করেছে ১৯৩৮ সালে এমনি লোকের সংখ্যা হল ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিছু কিছু বেকার ছিল, তখন বীমা-ভান্ডার থেকেই তাদের নিয়মিত অর্থসাহায্য করা হতো। ১৯৩০ সালের পর বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। এবং তার পর থেকে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই কর্মীর অভাব দেখা দিয়েছে।

প্রাক-বিপ্লব রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় যে, সুস্থ সমাজগঠনের পথে প্রবল অন্তরায় হল সে দেশে মাতৃত্ব ও সন্তান-পালনের প্রতি রাষ্ট্রের অবহেলা। পেটের দায়ে মেয়েরা কল-কারখানায় কাজ নেয়, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দৈনন্দিন অন্নের সংস্থান করে, বস্তিতে আলো হাওয়া পায় না, হাজার রকম অসুস্থতায় ভোগে, প্রয়োজনমত চিকিৎসা হয় না। ফলে সুস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। গর্ভপাত, অকাল-প্রসব, শিশু-মৃত্যু হল তাদের জীবনে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। এই মারাত্মক অবস্থা থেকে মেয়েদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সোভিয়েট রাষ্ট্র। যৌথ কৃষি-

শালার মেয়েরা সন্তান প্রসবের আগে এক মাস এবং পরে এক মাস ছুটি পেয়ে থাকে; এই সময়ে তারা পূর্বে যা উপার্জন করত তার অর্ধেক অর্থ পায়। তাছাড়া প্রসবের পর মায়েরা নানা রকম ছোট বড় সাহায্যও সরকারের কাছ থেকে পায় যা অন্য যে-কোন দেশের মেয়েদের চোখে স্বপ্নের সমান। শুধু আইন জারী করেই বসে নেই সোভিয়েট সরকার। বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে সারা দেশ জুড়ে সে হাজার হাজার শিশুসদন, কিন্ডারগার্টেন, খেলার মাঠ ইত্যাদি ব্যবস্থা করেছে। আগেকার কালে কী হত? প্রসবের আগে বা পরে মেয়েরা কোন রকম ছুটি পেত না। অন্তঃসত্ত্বা হলেই তাদের চাকরি থেকে জবাব দেওয়া হত। ফলে গর্ভাবস্থার কথা তারা গোপন করত। এবং অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় কাজ করতে করতে সন্তানের জন্ম দিত। প্রাকবিপ্লব যুগের হিসাব ঘেঁটে দেখা গেছে যে, জারের আমলে প্রতি বছর ৩০,০০০ মেয়ে প্রসবকালে মারা যেত।

বিপ্লবের পর কয়েক বছর সোভিয়েট দেশকে এক অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। এবং তারই ফলে ১৯২০ সালে আইন করে গর্ভপাতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। কারণ তখন অনেক দারিদ্র্যক্লিষ্ট মায়েদের এ ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। এরই সাহায্যে দারিদ্র্যের কবল থেকে তারা রক্ষা পেয়েছিল কিন্তু বর্তমানে আইন জারী করে তা বন্ধ করা হয়েছে। কারণ আজ সোভিয়েটের মেয়েরা ভবিষ্যতের জন্যে কোন রকম ভয় না করেই মা হিসেবে তাদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এই হল সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার বাস্তব রূপ। মেয়েদের জীবনে সমস্ত রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতা, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, সমস্ত রকম কাজকর্মে (শারীরিক ক্ষতিকারক কাজ বাদে) ও শিক্ষা-দীক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার এবং মাতৃত্বের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি—এরই ভিত্তিতে প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের একাত্মতা গড়ে উঠেছে।

কর্মময় জীবনের অগ্রগতি

জারের আমলে মেয়ে শ্রমিকদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের অত্যন্ত অল্প মজুরিতে পাওয়া যেত বলে মিল-মালিকরা মেয়েদের বেশী সংখ্যায় কাজ দিত। পুরুষরা যা মজুরি পেত তার অর্ধেকেরও কম (অর্থাৎ শতকরা ৪৭·৭ ভাগ) পেত মেয়েরা। সুতরাং প্রত্যেক শিল্পাঞ্চলেই এর সুযোগ গ্রহণ করতে মিল-মালিকরা ছাড়েনি। ১৯০০ থেকে ১৯১৩ সাল। এই সময়ের মধ্যে হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল মেয়ে মজুরের সংখ্যা। গোড়ার দিকে ছিল ২,৫৯,০০০, পরে গিয়ে দাঁড়াল ৫,৫৭,৪০০। ১৯১৩ সালের শেষের দিকে আরও বাড়ল। অর্থাৎ সমস্ত রুশ দেশে মেয়ে মজুরদের মোট সংখ্যা হল ৬,৩৬,০০০। আর বেশীর ভাগ মেয়ে মজুরই হল কাপড়ের কলের যেখানে দুর্দশা ও খাটুনির অন্ত ছিল না। মেয়ে ও শিশু শ্রমিকদের দৈনিক প্রায় তেরো থেকে পনের ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হত।

১৯১৪ সাল থেকে আরম্ভ হল প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগুন। পুরুষরা চলে গেল মাঠে লড়াই-এর সৈন্য হয়ে। মেয়েরা গিয়ে জমল কলকারখানায়। ছয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার থেকে আট লক্ষ আশি হাজারে গিয়ে দাঁড়াল মেয়ে-শ্রমিকদের সংখ্যা। সংখ্যা বাড়ল কিন্তু দুর্দশা ঘুচল না এতটুকু। মজুরি কমলো, কাজের ঘণ্টা বাড়ল; খাদ্যদ্রব্য আক্রা হল। সঙ্গে সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ল অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম। লড়াই-এর ময়দানে দলে দলে প্রাণ দিল সৈন্যেরা। সাহায্যের অভাবে ঘরে ঘরে উপোসী রইল তাদের মা-বোন। এমনি এক শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হল রাশিয়ার দরিদ্র মেয়েদের।

শুধু অর্থনৈতিক অবস্থাই নয়, জারের শাসনে মেয়ে মজুরদের সাংস্কৃতিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত হতাশাপূর্ণ। ১৯১৮ সালে শতকরা পঞ্চাশজন মেয়ে মজুরদের অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত ছিল না।

১৯১৭ সালে বিপ্লবের সাফল্য কিন্তু এক নতুন ঘোষণা পাঠাল মেয়ে

মজুরদের বস্তিতে বস্তিতে, চাষী-মেয়েদের কুটিরে কুটিরে। বহু যুগের কালো শাসনের পালা শেষ হল—এবার বৈপ্লবিক জাগৃতির অভ্যুদয়। বিপ্লবের প্রথম বছরেই শহরে ও গ্রামে গড়ে উঠল শিশুসদন, কিণ্ডার-গার্টেন ও সাধারণ ভোজনাগার। গার্হস্থ জীবনের অমানুষিক খাটুনি আর বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে মেয়েরা পুরুষের সমান স্বাধীন হবার সুযোগ পেল।

কিন্তু বহু যুগের শাসন আর অত্যাচার, অবনতি আর অপমানের গ্লানি মেয়েদের মন থেকে সরে যেতে সময় নিল। যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় তাদের জীবনে একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই ঝুটো সত্যকে দূর করবার জন্যে দরকার হয়ে পড়ল আমূল পুনর্গঠনের। এই পুনর্গঠনের জন্যে ১৯১৭ থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েট দেশকে নানা পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বিপ্লবের পর ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সামরিক সমাজতন্ত্রের (war communism) যুগ। সে সময়ে ঘরে বাইরে দেশী-বিদেশী দুশমনরা নবজাতক সোভিয়েটকে ছিঁড়ে খাবার জন্য উদ্যত হল। চৌদ্দটি বিদেশী জাতির সৈন্যেরা পা বাড়ালো আঁতুড়-ঘরে নতুন শিশুকে হত্যা করতে। সেদিন সোভিয়েটবাসীর জীবনে এক মহা দুর্যোগ! হাজার হাজার মজুর চাষীর ছেলে লালফৌজে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে গেছে ময়দানে; মেয়েরা ঘর সামলাচ্ছে সজাগ হয়ে। কাঁচামাল নেই—কলকারখানা বন্ধ। মিলের বাঁশী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘরে ঘরে ধুঁকছে বেকার মেয়েরা। ১৯২১ সালের পর একটু ভালো হল অবস্থা। সমাজগঠনের প্রচেষ্টা শুরু হল। ঠিক হল নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন হবে......কাজ পাবে, রুটি পাবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ; গৃহ-যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করা হবে নতুনভাবে। ১৯২১ সালে বাস্তবে প্রবর্তিত হল সেই 'নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'। তার পরের বছরেই বৃদ্ধি পেল মেয়ে-শ্রমিকদের সংখ্যা। ছয় লক্ষ ছাত্রিশ হাজার থেকে এক লাফে সাত লক্ষ ঊনষাট হাজার তিন শোয়। শুধু কলকারখানাতেই নয়, সমাজের বিভিন্ন কাজকর্মে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মেয়েরা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাক-বিপ্লব যুগের তুলনায় সোভিয়েট ব্যবস্থার

আওতায় হাজার হাজার মেয়েরা এগিয়ে এসেছে কর্মক্ষেত্রে। মেয়েদের এই অগ্রগতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না ১৯১৭ সালের আগে মালিকরা কলকারখানায় মেয়েদের কাজ দিত এই কারণে যে, তাদের অত্যন্ত অল্প মজুরিতে পাওয়া যেত। ফলে হাজার হাজার টাকার মুনাফা লুটতে পারত কল-মালিকরা। কিন্তু বিপ্লবোত্তর যুগে মেয়ে-পুরুষ শ্রমিকের মজুরির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। আর তাছাড়া সমস্ত কলকারখানা পরিণত হল রাষ্ট্র তথা জনসাধারণের সম্পত্তিতে। সমান মজুরি ধার্য হল স্ত্রী-পুরুষের জন্যে। অর্থাৎ অল্প মজুরি বা মুনাফা নয়, সমাজ-জীবনের বিস্তৃতির মধ্যে অসংখ্য মেয়েদের টেনে আনাই হল এই অগ্রগতির তাৎপর্য। এবং সেকারণেই ১৯২৯ সালের মধ্যে ২,৫৭,০০০ শিশুসদন ও ৪,৫০,০০০ কিণ্ডারগার্টেন খোলা হল সমস্ত দেশে; ৭,৫০,০০০ লোকের আহারের ব্যবস্থা হল সাধারণ ভোজনাগারে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল শিক্ষার তুমুল আয়োজন। প্রাক-বিপ্লব যুগে শতকরা মাত্র তের ভাগ মেয়ে লেখাপড়া জানত আর তাদের অধিকাংশই ছিল অর্থশালী। অভিজাত জমিদার, কলকারখানার মালিক, সরকারী কর্মচারী ও ধর্মযাজক—এদের ছেলেমেয়েরাই স্কুল-কলেজে পড়ত। চাষী-মজুরের মেয়েরা থাকত নিরক্ষর। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম বছর থেকেই তা কমতে শুরু করল আশাতীতভাবে। একশোজনের মধ্যে ৮৪·২ ভাগ মেয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠল। দলে দলে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষালয়ে গিয়ে ভর্তি হল তারা। সাধারণ শ্রমিক হয়ে থাকলেই চলবে না—দেশের খাতিরে, নিজেদের ভবিষ্যতের খাতিরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষায় সুদক্ষ হয়ে উঠতে হবে—একথা মনে প্রাণে বুঝল তারা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েট দেশকে সমাজতান্ত্রিক নীতি মাফিক গড়ে তোলার চেষ্টা হল। এই অতিকায় প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলার জন্যে সেদিন সারা দেশের লোক কী ভাবে আলোড়িত ও উৎসাহিত হয়েছিল তা তাদের কর্মোদ্যম ও সাফল্য থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ডাকে সর্বহারা মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে এগিয়ে

এসেছিল সমানভাবে। এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের অপরিসীম কর্মস্পৃহার প্রমাণ দিয়েছিল।

পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। গতবারের তুলনায় এই পরিকল্পনা আরও বৃহৎ, আরও সম্ভাবনাময়। গত পাঁচ বছরে যে সব জিনিস তৈরী হল সে সব জিনিসকে ঠিক মত কাজে লাগানো হল এই পরিকল্পনার অন্যতম কর্মসূচী। এর পর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি, কলকারখানা, যন্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, এই হল দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং এই বিপুল প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্যে মেয়েদের অপরিহার্যতা আরও বৃহৎভাবে স্বীকৃত হল।

কলকারখানা বাদে অন্যান্য কাজকর্মে মেয়েদের নেওয়ার প্রধান বাধা ছিল একটা। অনেক কাজেই এতটা শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হতো যে মেয়েদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতকরা আশি ভাগ শারীরিক শ্রম-চালিত কাজগুলি যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যন্ত্রচালিত হতে পারে তার ব্যবস্থা হল। বর্তমানে তো সোভিয়েট ইউনিয়নে এ ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

কলকারখানা বা শারীরিক শ্রমবহুল অন্যান্য কাজ ছাড়াও মেয়েদের শিল্প-কর্মে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। ফলে আর নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই মেয়েরা। সাম্প্রতিক এক হিসাব থেকে জানা যায় যে, এক কোটি দশ লক্ষের ওপর মেয়ে সোভিয়েট দেশের কলকারখানা, যান-বাহন ও নির্মাণ কাজে নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ সোভিয়েট দেশের মোট শ্রমজীবী জনতার শতকরা চল্লিশ ভাগ হল মেয়ে। ১৯৩৫ সালের একটি হিসাবে কর্মরত মেয়েদের নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়ঃ

বড় বড় কলকারখানায়	২৬,২৭,০০০
নির্মাণকার্যে	৪,৫০,০০০
যানবাহনে	৩,৮৪,০০০
বাণিজ্য ও সাধারণ ভোজনাগারে	৮,২২,০০০
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাষ্ট্র পরিচালনায়	১৯,৭৮,০০০
কৃষিকার্যে	৬,৮৫,০০০

জারের আমলে শতকরা আশি ভাগ মেয়ে-শ্রমিক কাজ করত কাপড়ের কলে; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৬৭ ভাগে। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বদলে গেল আগাগোড়া। মেয়েরা অন্যান্য কাজ-কর্ম পাওয়ার সুযোগ পেল। ফলে ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি কাপড়ের কলে মেয়ে শ্রমিকদের সংখ্যা দাঁড়ালো এক তৃতীয়াংশের কম (৩১·৭ ভাগ), বাকী যারা তারা সবাই পুরুষ। অন্যদিকে শ্রমবহুল কাজকর্মে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ল। কেমিক্যাল, লোহা কারখানা, বিদ্যুৎ কল—এই সব কাজে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হল মেয়েরা।

সোভিয়েট মেয়েদের উন্নতির পেছনে এর গুরুত্ব অনেকখানি; কারণ বর্তমানে মেয়েরা সাধারণ শ্রমিকই নয়, তারা এককেটি বিষয়ে রীতিমত পারদর্শিনী হয়ে উঠেছে। ফলে দেশের উৎপাদনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণ। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা, তাদের সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য। কয়েক বছর আগে তারা কিংবা তাদের বাপ মা যে সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দারিদ্র্য-জীর্ণ পঙ্কিল সমাজকে উপলব্ধি করতো, অভিশাপ দিত, সে সমাজ গেছে বদলে, তাদের সেই হলদে ফ্যাকাশে দৃষ্টি হয়েছে অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল।

সমবায় শিল্পে মেয়েদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সময়ে (১৯২৮ সালে) সমবায় শিল্পে কাজ করত ২,৬৫,০০০ মেয়ে। পরিকল্পনা সমাপ্তির সময়ে (১৯৩৩ সালে) দেখা গেল মেয়ে-কর্মীর মোট সংখ্যা হল ৭,০২,৬০০। সমস্ত রকম হাতের কাজ এই সমবায় সংঘের মারফতই পরিচালিত হয়ে থাকে।

সোভিয়েট কৃষিকার্যের দিকে তাকালে আরও বেশী অবাক হতে হয়। কারণ সমাজতন্ত্র কৃষিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে; পর-নির্ভরশীল মেয়েদের দিয়েছে আর্থিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য।

আগের দিনে এককেটি চাষী পরিবার আমাদের দেশের চাষীদের মতই খন্ড খন্ড জমিতে পুরনো প্রথায় জরাজীর্ণ হাল বলদ নিয়ে চাষ করত।

না ছিল তাদের জলসেচ বা সারের ব্যবস্থা, না ছিল তাদের ফসল বোনা বা কাটা ঝাড়ার কোন যন্ত্র। মাথা পর্যন্ত তাদের বিকিয়ে থাকত দেনায়, কৃষিঋণ আর খাজনার বোঝায়, অনাহারের আগুন জ্বলত তাদের পেটে, জমিদার ও তার পাইক বরকন্দাজদের জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে ভিটে ছাড়তে হতো তাদের। এমনি এক মর্মান্তিক অবস্থায় ডুবে ছিল কৃষি-সমাজের আপাদমস্তক।

সোভিয়েট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জমিদাররা নিশ্চিহ্ন হল আর জোতদারদের ক্ষমতা হ্রাস পেল। শোষণের বিষদাঁতগুলো ভেঙে গেল তাদের। তারপর ধীরে ধীরে কার্যকরী হল যৌথ প্রথায় চাষ করার নীতি। বড় বড় যৌথ ও সরকারী কৃষিশালা গড়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সংঘবদ্ধ হল চাষীরা। জেলায় জেলায় বসল ট্রাকটর ও অন্যান্য যন্ত্রাদির স্টেশন। দলে দলে ছেলেমেয়েরা ট্রাকটর, কম্বাইন ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র চালাতে শিখতে আরম্ভ করল। সমস্ত সোভিয়েট কৃষিব্যবস্থা জুড়ে এল এক প্রকান্ড বিপ্লব।

১৯২৯ সাল পর্যন্ত শতকরা মাত্র ৪·৯ ভাগ কৃষিক্ষেত্র যৌথ কৃষিব্যবস্থার আওতায় আনা গিয়েছিল কিন্তু দশ বছরের মধ্যে (১৯৩৮ সালে) শতকরা ৯৯·৩ ভাগ চাষের জমি যৌথকৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯২৮ সালে সরকারী খামারের সংখ্যা ছিল ১,৪০৭। নয় বছর পরে দাঁড়িয়েছে ৩,৯৯২ এ। এই অবস্থান্তরের মুখে মেয়েরা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এসে যৌথ কৃষিশালার কাজে যোগ দিয়েছে ও কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়েছে।

তবু প্রথম দিকে কৃষক-মেয়েদের মধ্যে যৌথ-কৃষি প্রথা সম্বন্ধে উপযুক্ত সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়নি। শৃঙ্খলার অভাব, কাজে অনিয়মিত উপস্থিতি এবং কম কাজ—এরই মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করা গিয়েছিল এর গুরুত্বের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য। কিন্তু ১৯৩৩-৩৫ সালের মধ্যে পরিবর্তিত হল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী। তাদের সহযোগিতা, কর্মক্ষমতা এবং শৃঙ্খলা আরো দৃঢ় হয়ে প্রকাশ পেল। আগল ভেঙে বেরিয়ে এল সব বয়সের কৃষক-মেয়েরা। এর ফলে কি শুধুই আর্থিক স্বাতন্ত্র্য পেল তারা? শুধু তাই নয়, সামাজিক মর্যাদায় মাথা উঁচিয়ে তারা

পুরুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। শিক্ষায় দীক্ষায় তারা আজ উপযুক্ত হয়েছে পুরুষের পাশে দাঁড়াবার। যৌথ কৃষিব্যবস্থা সোভিয়েট কৃষক-মেয়েদের জীবনে এই অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে পেরেছে।

১৯২৯-৩০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট দেশে মোট ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার লোক বেকার ছিল। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক হল মেয়ে। আবার এই মেয়ে-বেকারদের অধিকাংশই ছিল গ্রামাঞ্চলের। গ্রামে অন্ন-সংস্থানের কোন ব্যবস্থা না হলে তারা ছুটতো শহরের দিকে। কিন্তু যৌথ-প্রথায় চাষবাস হওয়ার পর ১৯৩০ সাল থেকে এ সমস্যা সম্পূর্ণভাবে ঘুচে গেল।

যৌথ খামারের একশো জনের মধ্যে ৩৭ জন হল মেয়ে কর্মী। ভবিষ্যতের প্রতি তাদের অগাধ আত্ম-বিশ্বাস এবং বৃত্তি-নির্বাচনে নির্বাধ স্বাধীনতা তাদের জীবনে এক নতুন বিকাশ ঘটিয়েছে। আসল কথা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা তাদের আকর্ষণ করেছে বলেই তারা এগিয়ে এসেছে নির্ভয়ে।

খাওয়ার সুবন্দোবস্ত, পরবার কাপড়, থাকবার বাড়ী, ছুটিতে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা, নিখরচায় ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা, শিশু-সন্তানদের অর্থসাহায্য, প্রসূতিদের জন্যে দীর্ঘ ছুটি ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে দেখাশোনা, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, আমোদপ্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—মেয়েদের জীবনে এক নিশ্চিতি এনেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি ও অর্থোন্নতি তো আছেই।

সোভিয়েট বিপ্লবের পর যে সব মেয়েরা কলকারখানায় এসে যোগ দেয় তাদের মধ্যে অধিকাংশই হল খাঁটি মজুর যারা জারের আমলে মিল মালিকদের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হত। তা ছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর থেকেও মেয়েরা এগিয়ে আসে। গ্রামাঞ্চল থেকেও এগিয়ে আসে অনেকে। গার্হস্থ্য জীবনের সংকীর্ণ পরিমিতি পেরিয়ে সমাজের রাজপথে এসে দাঁড়ায় তারা, যেখানে মানুষের সৃজনী-শক্তি জীবনের নতুন উপনিবেশ আবিষ্কার করে চলেছে। "এ আমাদের দেশ, আমাদের ঘরবাড়ী, আমাদের সমাজ, একে নতুনভাবে গঠন করার দায়িত্ব আমাদের" এমনি সমাজমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা (socialist competition) হল উৎপাদন বৃদ্ধির এক প্রধান হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যে সোভিয়েট দেশের উৎপাদন জগতে এক অবিশ্বাস্য যুগান্তর এসেছে। প্রত্যেক কারখানায় কারখানায় এই প্রতিযোগিতা হয়; শ্রমিকরা যোগ দেয় দলে দলে। কে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন বাড়াতে পারে, কে কলকব্জার উন্নতি-সাধন করে যন্ত্রের গতি বাড়াতে পারে—এই নিয়ে সমাজতান্ত্রিক লড়াই। পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও এই প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হয়েছে। বয়নশিল্পী এভ্‌ডোকিয়া ও মেরিয়া ভিনোগ্রাডোভা, অডিণ্ট্‌-জোভা, ফাদীভা ও বুননকল-শিল্পী ফেডেরোভার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। এঁরা সারা সোভিয়েট দেশে 'শক্‌-ওয়ার্কার' বা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত কারিগর বলে খ্যাত।

এই প্রতিযোগিতার আন্দোলনকে 'স্টাখানোভ আন্দোলন' বলা হয়ে থাকে। ১৯৩৬ সালে ডন বেসিনের কয়লা খনির শ্রমিক আলেক্‌সাই স্টাখানোভ প্রথমে এই উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনে অগ্রণী হন এবং তারপর তাঁরই নামে এই আন্দোলন সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হল উৎপাদনের সাধারণ হার ও গতিকে অতিক্রম করা। এই হার ও গতি অতিক্রম ও রেকর্ড স্থাপনের পথে প্রধান উৎস হল শ্রমিকের সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতা।

কৃষিজগতেও এমনি মেয়েদের দান অসামান্য। প্রতি বছর কৃষিক্ষেত্রে যে ফসল বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পেছনে মেয়েদের পরিশ্রম ও আন্তরিকতা অপরিসীম। ১৯৩৫ সালে পাঁচশো লোকের সহযোগিতায় যে কৃষি আন্দোলন আরম্ভ হয় তার নেতৃত্ব করে মেরিয়া ডেমচেংকো নামে একটি মেয়ে। সে সময়ে এক হেক্‌টেয়ার (প্রায় আড়াই একর) জমিতে ১৩,২০০ পাউণ্ড বীট উৎপন্ন হতো। আন্দোলনকারীরা সেখানে ৫০,০০০ পাউণ্ড বীট ফলাবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

সোভিয়েট এশিয়ায় (খিরগিজ, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনি-স্তান ও কাজাকস্তান প্রভৃতি জায়গায়) যৌথ কৃষিকাজ ও তুলো চাষের বেলাতেও এমনি আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছে। বিপ্লবের আগে মধ্য-এশিয়ার মেয়েরা ছিল পুরুষের বাঁদী। ঘর ছেড়ে তাদের বাইরে বার

হওয়ার কোন স্বাধীনতা ছিল না। সোভিয়েট আমলে কিন্তু তারা নতুন শিক্ষা ও মর্যাদার অধিকারিণী হয়েছে। তুলো চাষের সমস্ত রীতিনীতি সম্বন্ধে তারা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। ১৯৩৫ সালে তারা তুলো উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি করে। গো-প্রজনন ব্যাপারেও তারা তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজ-চেতনা ও রাজনৈতিক জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েরা কর্মবহুল উৎপাদন জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। অত্যন্ত সহজে এই রূপান্তর ঘটেছে মনে করলে ভুল করা হবে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে রীতিমত সংগ্রাম চালিয়ে, পুরনো ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে এর পথ তৈরী করতে হয়েছে। প্রাক-বিপ্লব যুগে পুরুষদের মধ্যে, বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, মেয়েরা হল সমাজের জঞ্জাল, মেয়েরা হল অস্পৃশ্য, অপবিত্র, কেবল সন্তান সৃষ্টি করাই তাদের কাজ; দেশের ভালো মন্দের ওপর তাদের কথা বলবার অধিকার নেই কোন। এই মতের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে বলশেভিকদের, সোভিয়েট দেশের প্রগতিবাদীদের। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর ধীরে ধীরে গোঁড়া কৃষকরা মেনে নিয়েছে যে স্টালিনের কথাই ঠিক—'যৌথ কৃষিক্ষেত্রে মেয়েরাই হল প্রবল শক্তি।'

প্রাক-বিপ্লব যুগের কলকারখানার কাজের সঙ্গে বিপ্লবোত্তর যুগে শ্রমিক-পরিচালিত কলকারখানার কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ১৯১৭ সালের আগে জার-শাসিত ও বিদেশী মূলধন-কবলিত* আধা-সামন্ততান্ত্রিক শ্রমশিল্পের সঙ্গে ১৯১৭ সালের পরবর্তী বৈপ্লবিক পরিবর্তন-সাধনকে নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। আগে জারের পরিবার ছিল রুশ সাম্রাজ্যের গোটা মালিক, দেশী ও বিদেশী মিল-মালিকরা ছিল সমস্ত কারখানার একচ্ছত্র অধিপতি; শ্রমিকরা ছিল তাদের পায়ের নীচে। দেশের ভালো-মন্দ, বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্ধারণ করার দায়িত্ব ছিল না নিজের ওপর, বরং নিজেদের দেশে তারা ছিল পরবাসী! সুতরাং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, শারীরিক শ্রম পরের দোরে বিক্রী করে, দৈনিক ১১ ঘণ্টা (কোন কোন কারখানায় ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হতো) পরিশ্রম করে তারা তাদের জীবিকা আহরণ করতো। এই জীবিকা-আহরণ সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই। তখনকার রাশিয়ার মর্মান্তিক বিপর্যয়ের পরিমাণ জানতে হলে আমাদের নিজেদের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখলেই হবে। চাকরির জন্যে কাড়াকাড়ি, রুটির জন্যে কাড়া-কাড়ি, সামান্যতম ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি—এই অমানুষিক কাড়াকাড়িই হল আজকের ভারতবর্ষের চেহারা।

নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাশিয়া এক নতুন দিকে মোড় নিল। মানুষের মনে জন্মালো এক নতুন মূল্যবোধ, এক নতুন সমাজচেতনা যে এ দেশ আমার—এ দেশের জল, মাটি, হাওয়ার ওপর প্রত্যেকটি মানুষের সমান অধিকার; এ কলকারখানার মালিকানা আর কোন পুঁজিপতির নয়, দেশের প্রত্যেকটি লোকের; এ জমির এক কণা মাটিও জমিদার বা জোতদার কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, চাষীরাই

* ১৯১৭ সালের আগে বৃটিশ, মার্কিন, জার্মান ও ফরাসী পুঁজিপতিরাই ছিল রুশ শ্রমশিল্পের আসল মালিক।

হল জমির মালিক। অতএব হুঁশিয়ার সোভিয়েট দেশের নাগরিক! আজ সত্যি সত্যিই মজুর-কিসান রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন রকম গাফিলতি না দেখিয়ে জোর কদমে অগ্রসর হও তোমার কাজে।
মেয়েরা ছিল সবচেয়ে পিছিয়ে, তাই সবচেয়ে এগিয়ে এল তারাই। কলকারখানার নানারকম কাজকর্মে পারদর্শিনী হয়ে ওঠার জন্যে তাদের মধ্যে অপরিসীম উদ্দীপনা দেখা গেল। কারণ, শিল্পশিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য অনেকখানি। শিল্পজগতে মেয়েদের পশ্চাৎ-বর্তিতা সম্পূর্ণভাবে দূর না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকার মুক্তি ও সমতা সম্ভব নয়। একজন পারদর্শিনী মেয়ের পক্ষেই শিল্পে, সমাজে ও শিক্ষা জগতে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব কারণ তার পারদর্শিতাই তার জন্যে সভ্য জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।
এই কারণে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মেয়েদের কারখানায় টানার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে। সে সময়ে কেন্দ্রীয় কার্য-করী সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে বিশেষ করে এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং স্থির হয় যে, যদি সোভিয়েট দেশের ভবিষ্যত শিল্পজীবনে মেয়েদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে তাদের শিল্প ও ব্যাপক শিক্ষার দিকে সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে।
বিপ্লবপূর্ব যুগে যে সমস্ত মেয়ে-শ্রমিক ছিল, তাদের না ছিল কোন শিল্পশিক্ষা, না ছিল কোন দক্ষতা। তারা সবাই ছিল কাজ-না-জানা বা আধা-কাজ-জানা মজুরনী। শুধু শিল্পজগতে নয় জাতীয় জীবনেও এই ছিল তাদের একমাত্র পরিচয়। সুতরাং নারীসমাজের এই প্রকাণ্ড অংশকে শিল্পশিক্ষা দেওয়ার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ল সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ওপর।
দেখা গেছে যে ১৯২৭ সাল এমন কি ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত মেয়েদের শিল্পগত শিক্ষা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম ছিল। ফলে দলে দলে মেয়েরা কলকারখানায় যোগ দিলেও বেশীর ভাগ মেয়েই আধা-কাজ-জানা এবং কাজ-না-জানা স্তরে থেকে গিয়েছিল, উচ্চ শিল্পের কাজে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারেনি। কিন্তু এমন অনেক কাজে মেয়েরা যোগ দিয়েছিল যে কাজ আগে কোন দিন তারা করেনি। ১৯২৭-এ

শতকরা মাত্র ১.৬ ভাগ মেয়ে কৃষি-যন্ত্র বিভাগে কাজ করত; ১৯৩৪ সালে তা বেড়ে ২৫.৫ ভাগ হল। ধাতুশিল্পে চুল্লীঘরের কাজ বিপজ্জনক বলে মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ হলেও কপিকল ওঠানো নামানোর কাজে মেয়ে-শ্রমিকের সংখ্যা কম নয়। ১৯২৭ সালে একটি মেয়েও বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ঘরে কাজ করত না কিন্তু ১৯৩৪-এ সেখানকার ফিটারদের মধ্যে শতকরা তের ভাগ এবং বৈদ্যুতিক সুইচবোর্ড কর্মীদের মধ্যে বত্রিশ ভাগ হল মেয়ে। ১৯২৬ সালের শেষ দিকে মাত্র ৯০০ জন মেয়ে-মজুর নির্মাণকার্যে নিযুক্ত ছিল। চার বছর পরে তার সংখ্যা স্ফীত হয়ে সতের হাজারে দাঁড়ালো। বিপ্লবের আগে সোভিয়েট দেশে মেয়ে-ইঞ্জিনীয়ার ছিল মোট তিন জন। ১৯৩৭-এর হিসাব অনুযায়ী তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চব্বিশ হাজারে। এমনিভাবে সমস্ত রকম যানবাহনের কাজে, কলে কারখানায়, আপিসের কাজকর্মেই এক অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

সোভিয়েট শ্রমশিল্পে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের দান নিতান্ত অল্প নয়। কিশোর কিশোরীরা সাত বছর সাধারণ শিক্ষা পাওয়ার পর অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সে যে কোন কারখানা, যানবাহন বা কৃষি-শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে ভর্তি হতে পারে। এই বয়সেই অনেকে স্থির করে, তারা ভবিষ্যতে কী হবে, কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে এবং সেই ইচ্ছা অনুযায়ী তারা বিদ্যালয়ে গিয়ে কৃতিত্ব অর্জন করে। এই শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির কাজ কিন্তু অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কারণ এই কেন্দ্রগুলির ওপরই শিল্প-জগতের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে। ১৯৩৩ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সে বছরে শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯,৫৮,৯০০। তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা হল ১,৬২,৮০০। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির দিকে যদি তাকিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে সে দেশগুলিতে কত অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা শিক্ষার অভাবে, দারিদ্রের তাড়নায় কলকারখানায় কুলি মজুরের কাজ নেয় এবং কোন রকমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য, ভবিষ্যত সব কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমাদের নিজেদের দেশেও তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলবে। বিভিন্ন কলকারখানা ও কয়লা-খাদের মেয়ে

মজুরদের দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তাদের মধ্যে কত অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরীরা জীবনপাত করে রুটির সংস্থান করছে; দুর্নীতির আবর্তে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে তাদের সাধারণ মানবিক ও ও নৈতিক মূল্যবোধ। কিন্তু সোভিয়েট দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের কোন রকম শ্রমসাধ্য কাজ করা আইনবিরুদ্ধ।

শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছাত্রীদের সংখ্যা ও আগ্রহ লক্ষ্য করে ১৯৩১ সালে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এক নতুন আইন জারী করেন যে, প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমান হবে অর্থাৎ পঞ্চাশ ভাগ ছাত্র এবং পঞ্চাশ ভাগ ছাত্রী—এই ভাবে গঠিত হবে শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্রগুলি। ১৯৩৫ সালে কৃষি-শিক্ষাকেন্দ্রেও এই আইন বলবৎ হয়।

শিল্প-শিক্ষা জগতে মেয়েদের এই অভাবনীয় উন্নতির পেছনে আছে কলকারখানায় কাজ করার জন্যে এক প্রচণ্ড আগ্রহ ও নতুন কাজ শেখার জন্যে দুর্দমনীয় উৎসাহ। আগেকার দিনে মেয়ে-শ্রমিকেরা নিজেদের যোগ্যতা বা দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে কিছুমাত্র আগ্রহ নিত না কারণ তারা ভাবত যে, আজ এ কাজে আছি, কাল চলে যাবো অন্য কাজে। দক্ষতা বাড়িয়ে আর কী এমন লাভ হবে? মজুরি যা পাবার তাই পাবো, মিল-মালিক এক পয়সা বেশী দেবে না আমাদের দক্ষতা দেখে। আসলে পেটের দায়েই তারা কারখানায় কাজ করতে যেত। নতুন যুগে নতুন সমাজ ব্যবস্থার সূর্যালোকে বদলে যেতে লাগল সেই দৃষ্টিভঙ্গী। টাইপরাইটিং, কাপড়-সেলাই—এমনি সব হালকা কাজগুলো ছেড়ে মেয়েরা শ্রমসাধ্য কাজে যেতে চাইল। শ্রমিক পরিবারের মেয়েরা হতে চাইল লোহা কারখানা, ঢালাই কারখানা, যন্ত্রাদি তৈরির কারখানার শ্রম-সাধ্য কাজের কারিগর। এই চেতনার মধ্যে সমাজমুখী মনের এক নতুন বিস্ফার চোখে পড়ল।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দিকে "ইলিক্‌ট্রোকম্‌বিনাৎ" নামে মস্কোর এক শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ করে দেখা গেল যে, ছাত্রীদের ফলাফল ছাত্রদের সমতুল্য। ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ১৯৩৫ সালে বড় বড় কলকারখানার আট লক্ষ শ্রমিকদের টেকনিক্যাল পরীক্ষা নেওয়া হল কারণ সেই বছর থেকেই

প্রত্যেক শ্রমিকের ন্যূনতম দক্ষতার স্তর নির্ধারণ করা হয়। এবং এই ন্যূনতম দক্ষতা প্রত্যেক শ্রমিকের জন্যে আবশ্যিক। সেই পরীক্ষার ফলাফলেও মেয়ে-শ্রমিকরা পুরুষদের সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বেরিয়ে এল। শুধু তাই-ই নয়, কয়েকটা বিষয়ে তারা পুরুষদেরও অতিক্রম করে গেল। ১৯৩৬ সালে যন্ত্র-শিল্প, ধাতুশিল্প, কয়লাখনি ও কাপড়ের কলেও টেকনিক্যাল পরীক্ষার আয়োজন হয় এবং মেয়েদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণিত হয়।

এই জ্ঞান-আহরণের আন্দোলনে শুধু যে কিশোরী ও যুবতীরা এল তাই নয়, বৃদ্ধাদের মধ্যেও নতুন আশার স্ফুরণ দেখা গেল। ইয়ার্টসেভ কারখানার চুয়ান্ন বছরের এক বৃদ্ধা বয়নশিল্পী এগিয়ে এসে বললে "আমি চুয়ান্ন বছরের বুড়ী হয়েছি বটে তবু লেখাপড়া শিখতে চাই।" কী গভীর তাদের জ্ঞান-পিপাসা এই বৃদ্ধার কথা থেকেই তার প্রমাণ মেলে।

শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যে একমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই নয়, কারখানার কাজের পর অনেক শ্রমিকই এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে এসে শিক্ষা গ্রহণ করে।

সোভিয়েট দেশে গুণগত এবং পরিমাণগত দু-দিক থেকেই মেয়ে-শ্রমিকদের দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। এবার তাদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়া যাক। অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সমান মজুরি পায়। আবার কতক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে মেয়ে-শ্রমিকেরা পুরুষদের তুলনায় বেশী অর্থ পেয়ে থাকে যেমন যন্ত্র-নির্মাণের কাজে, কাপড়ের কলে। এরকম প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে, একটি আনাড়ী মেয়ে কারখানায় কাজ নিয়ে হঠাৎ কয়েক বছরের মধ্যে সব দিক দিয়ে রীতিমত বড় শিল্পী হয়ে উঠেছে আর সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে তার নাম।

১৯৩৪ সালে স্টালিনের কাছে লেখা লেনিনগ্রাদের মেয়ে-শ্রমিকদের এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, টুলো ফ্যাকটরীর জন্যে বারো হাজার কিলো-ওয়াটের এক জলচক্র (turbine) তৈরী করে দেওয়ার দায়িত্ব রেড পুটিলভ ফ্যাকটরীর এক বিভাগের ওপর এসে পড়ে। এই জল-চক্র

তৈরী করার জন্যে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আইভানোভা ও স্যাক্‌নভ্‌স্কায়া নামে দুটি মেয়ে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্ডারটি সম্পাদন করে। ১৯৩১ সালে আইভানোভা ছিল আনাড়ী মেয়েদের দলে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মস্কো শহরে পরিচারিকার কাজ করত ভেরা ব্রাগিনা। তার নিজের গ্রাম বব্‌রিকীতে নতুন কারখানা তৈরী হচ্ছে শুনে সেখানে কাজ নেয়। সাধারণভাবে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সে সাধারণ শিক্ষা ও টেকনিক্যাল জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করে। তিন বছর পরে এমোনিয়া কারখানার নির্মাণকার্যে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে কমপ্রেসারের কাজ দেওয়া হয়। এই কাজে সক্রিয় 'শক ওয়ার্কারের' যোগ্যতা দেখানোর ফলে 'অর্ডার অব দি ব্যানার অব লেনিন' উপাধি উপহার দেওয়া হয় তাকে। আইভানোভা কাপড় কলের ক্লডিয়া বুইকোভার নামও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯২৬ সালে যখন সে গ্রাম থেকে আইভানোভায় আসে তখন একেবারে অশিক্ষিতা ছিল সে। লেবার এক্সচেঞ্জ তাকে পাঠিয়ে দেয় ফেলিক্‌স্ জারঝিন্‌স্কি কারখানায়। সেখানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে। ১৯২৭-এ কাঠিম জড়ানোর কাজে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে সাধারণ ও টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করে। অল্প সময়ের মধ্যে সে তার বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হয় এবং ছাব্বিশটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের পঞ্চদশ বার্ষিকীতে সরকার থেকে তাকে 'অর্ডার অব দি লেনিন' উপাধি দান করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এমনি কত মেয়ে যে তাদের কৃতিত্বের জন্যে পুরস্কৃত হয়েছে তার ঠিক নেই। এবং এই কৃতিত্বের পরিমাণ প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে 'শক-ওয়ার্কার'-এর সংখ্যা। সমাজতন্ত্রী সমাজে এই অগ্রণী মেয়েরাই হল পথ প্রদর্শক। উৎপাদন জগতে এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের ফলেই সমাজের প্রত্যেকটি লোকের সমস্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে। এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমনি মানুষের

অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে তেমনি প্রসারিত হচ্ছে তার প্রয়োজন; আরও বেশী হাত পা ছড়িয়ে সে বাঁচতে চাইছে তার ক্রমবর্ধমান পরিমিতির মধ্যে।

সোভিয়েট দেশে মানুষের সংখ্যা ও তার চাহিদার হিসাব নিয়ে উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য দেশের মত শ্রমিকদের ফাঁকি দিয়ে, খরিদ্দারের পকেট কেটে এবং প্রতিযোগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে মাল উৎপন্ন হয় না ওদেশে। তাই যখন শ্রমিকরা উৎপাদন বাড়ায় তখন তারা এই ভেবেই উৎপাদন বাড়ায় যে, এই উৎপন্ন মাল তাদের এবং সমগ্র দেশবাসীর কল্যাণে লাগবে—কোন মুনাফাখোর মিলমালিক বা ব্যবসাদার লুটবে না এর লাভ। সোভিয়েট দেশের উৎপাদনের পেছনে এই সমাজতান্ত্রিক চেতনাই হল প্রধান মূলধন। এই মূলধনকে আশ্রয় করেই এগিয়ে চলেছে স্টাখানোভ আন্দোলন।

১৯১৭ থেকে ১৯৪৮ সাল—এই ৩১ বছরে সমস্ত সোভিয়েট দেশের শ্রমশিল্পের ধারা আগাগোড়া পালটে গেছে। পুরনো কালের ছোট ছোট হস্তচালিত যন্ত্রগুলো উঠে গিয়ে বসেছে নতুন নতুন বৈদ্যুতিক যন্ত্র। যে সোভিয়েট দেশ বিপ্লবের অব্যবহিত পর পর্যন্ত বড় বড় যন্ত্রের জন্যে বিদেশের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেই সোভিয়েট দেশেই তৈরী হচ্ছে সমস্ত রকম ভারী ভারী যন্ত্র। অর্থাৎ ৩১ বছর আগেকার অশিক্ষিত, অভুক্ত ও আনাড়ী শ্রমিকরাই যন্ত্র জগতে এই বিপ্লব এনেছে যা অন্য কোন দেশ পারেনি।

কিন্তু শ্রমিকদের এবং সমস্ত মানুষের জীবনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে মূল কথা হল অর্থনীতির পুঁজিবাদী রূপ পালটে যাওয়া। অর্থাৎ যে উৎপাদন-যন্ত্র অন্য সমস্ত দেশের গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে তার হস্তান্তর ঘটেছে। মুষ্টিমেয় কলমালিকদের হাত থেকে সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্র চলে এসেছে শ্রমিকদের হাতে আর তারাই এখন হল যন্ত্রের প্রকৃত চালক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে উৎপাদন-যন্ত্রের যে অস্বাভাবিক সম্বন্ধ ধনতান্ত্রিক যুগে রচিত হয়েছিল এখন আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক

পরিবর্তনসাধনের বড় কথা হল রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বিপ্লব। এই অর্থনৈতিক বিপ্লব বাদে কোন দেশই সোভিয়েট রাষ্ট্রের মত সমৃদ্ধির অধিকারী হতে পারে না।

যৌথ কৃষিশালার মেয়েরা

যৌথ কৃষিকাজ হল সোভিয়েট দেশের অন্যতম কৃতিত্ব। আগেকার দিনে আমাদের ভারতবর্ষের কৃষকদের মতই রাশিয়ার ঋণগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট কৃষকেরা ছোট ছোট জমিতে আলাদা আলাদা ভাবে চাষ করত, তাও অত্যন্ত প্রাচীন প্রথায়। যে সব জমিদার-জোতদারদের হাতে অনেক জমি এবং পয়সা তারা ক্ষেতমজুর রেখে চাষ করতো। যাদের হাতে অল্প জমি তাদের অনেকেই হাল বলদ ধার করে, সারের অপেক্ষায় না থেকে কোনগতিকে চাষবাস করত। কিন্তু ব্যক্তিগত ছোট ছোট জমিতে বিভক্ত হয়ে চাষ করার অসুবিধা অনেক এবং বর্তমান যুগে তা সম্ভবও নয়। কারণ যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থাও পরিবর্তিত হচ্ছে। আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে নতুনভাবে গঠিত হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা, পালটাচ্ছে তার হাতিয়ার। সুতরাং সাধারণ অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃষিব্যবস্থারও যে একটা পরিবর্তন আসবে তা সহজেই বোঝা যায়। যদি অন্যান্য দেশের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী এককেটি কৃষক তার আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য মাফিক আলাদা জমিতে চাষ করে তাহলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া ও ফসলবৃদ্ধির প্রশ্ন কল্পনারও বাইরে। কারণ ঐ কয়েক হাত জমিতে কোথায় চলবে ট্রাকটর, কোথায় বসবে কম্বাইন, কী ভাবে যন্ত্র দিয়ে বীজ বোনা হবে জমিতে আর কী করে ফসল কাটা হবে যন্ত্রের সাহায্যে? আর তাছাড়া সাধারণ কৃষকের পক্ষে কি ঐ যন্ত্রগুলি কেনা সম্ভব? কারণ যে কৃষক জমিদারের খাজনা দিতে ও পরিবারের অন্নবস্ত্র জোটাতে পারে না, যে কৃষক ঋণ করে ও ধান কর্জ করে কৃষিকাজ চালায়, সেই কৃষকের চোখে ঐ দানবীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি এক প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন। অথচ ঐ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলির উপযুক্ত ব্যবহার না করেও উপায় নেই। মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করে নতুন সুখ, সম্পদ, সমৃদ্ধি ও বিশ্রামের অধিকার দিতে হবে। এই সমস্যার ব্যাপক

সমাধান হয়েছে সোভিয়েট দেশে।
১৮৬০ সাল পর্যন্ত রুশ সাম্রাজ্যে ছিল দাস-প্রথার অপ্রতিহত প্রভাব। মানুষের ব্যক্তিত্ব বলে কোন জিনিস সেদিন জন্মাতে দেওয়া হয়নি দাসদের মধ্যে। নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার অধিকার ছিল না দাসদের। প্রভুরা জমি বিক্রী করলে সেই জমির সঙ্গে সঙ্গে দাসেরাও হস্তান্তরিত হয়ে যেত নতুন প্রভুর হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু প্রবল আন্দোলনের ফলে ১৮৬০ সালে দাস-প্রথার জীর্ণ শিকল ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে এসে মানুষের মনে নতুন ব্যক্তিত্ববোধ জন্মগ্রহণ করে। তবু ওপর-আলার অর্থনৈতিক শোষণ তাদের বাঁকানো শিরদাঁড়াকে সোজা হতে দিল না। যে চাষ করে প্রকৃত পক্ষে জমির মালিক হল না সে। চাষীরা হয়ে রইল চিনির বলদ।
সোভিয়েট বিপ্লব এই চিনির বলদদের জীবনে সত্যিকারের মুক্তির ঘোষণা নিয়ে এল। বিপ্লবের পর জমিদার বা গির্জা কারো দখলেই এক কাঠা জমিও থাকল না। বিনা ক্ষতিপূরণে সে জমিগুলি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হল। রাতারাতি চল্লিশ কোটি একরেরও বেশী জমির মালিক হয়ে বসল কৃষকরা। পঞ্চাশ কোটি রুবল খাজনা আর জমিদার-জোতদারদের নির্যাতনের হাত থেকে চির-দিনের মত নিষ্কৃতি পেল তারা।
কিন্তু নতুন সমাজের অগ্রদূত বলশেভিকরা শুধু জমি বিলি করেই বসে রইল না। কৃষকদের বোঝালো যে পুরনো প্রথায় চাষ করলে চলবে না। যুগ পালটেছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের চাষের রীতিনীতিও পালটাতে হবে। ফসল ফলাতে হবে দশগুণ। কারণ তোমরা এতদিন মজুরদের, সাধারণ দরিদ্র মানুষদের আধপেটা খাইয়ে এসেছো; তাদেরও পয়সা ছিল না, তোমাদেরও গোলায় ফসল ছিল না, কিন্তু এখন পেট ভরে খাওয়াতে হবে প্রত্যেকটি মানুষকে; তোমরা হলে অন্নদাতা। অতএব ছোট ছোট জমির টুকরোগুলোকে এক করে ফেলে বড় বড় খামার তৈরী করো এবং সেখানে যৌথ প্রথায় কাজ করো তোমরা সকলে। যারা যারা যৌথ খামারের সভ্য হবে তারা সকলেই হবে সমস্ত নিয়োজিত শ্রমের

মালিক। সকলেই সমান অংশের অধিকারী হবে। 'প্রত্যেকে সকলের জন্যে এবং সকলে প্রত্যেকের জন্যে' এই নীতিতে ফসল বাড়বে বহুগুণ ও তোমাদের পরিশ্রমও লাঘব হবে। আমরা রাষ্ট্র থেকে তোমাদের ট্রাকটর দেব, কম্‌বাইন দেব, বীজ বোনবার ও জল দেবার যে সব যন্ত্র লাগে দেব। তোমরা যাতে ন্যায্য দাম পাও তার সমস্ত ব্যবস্থা করব; তোমাদের ঘরে ঘরে বিজলী বাতি পৌঁছিয়ে দেব, নতুন ঘর বানাবার জন্যে মালমশলা দেব, যানবাহনের ব্যবস্থা করব গ্রামে, তোমাদের প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা মেটাব। সে দিন অত্যাচারিত, নিগৃহীত কৃষকদের জীবনে এক নতুন ঐশ্বর্যের আলো বিস্ফারিত হয়ে উঠল! তবু বহু দিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষক-সমাজ সহজে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। হাজার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল কারণ বহু যুগের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি পাশবিক মমতা—এ সব কাটিয়ে উঠে নতুন সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করা নিতান্ত সহজ প্রক্রিয়া নয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে কৃষিক্ষেত্রে সমগ্রীকরণের নীতি প্রথম কার্যকরী করা হল। কৃষকদের নতুন যুগের তাৎপর্য বোঝানো হল, সমাজতান্ত্রিক চেতনার কথা বোঝানো হল। উৎপাদন-যন্ত্রের হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রত্যেকটি রীতিনীতিকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে একথা কেউ তখনই বুঝল, কেউ দেরীতে বুঝল। যারা তখনই বুঝল তারা অগ্রসর হল যৌথ খামারের কাজে। ১৯২৯ সালে তাই দেখা গেল যে শতকরা ৪·৯ ভাগ (প্রায় শতকরা পাঁচ ভাগ) কৃষিক্ষেত্র যৌথ খামারের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ অন্যান্য কৃষকদের সামনে এই খামারগুলি এক নতুন কৃষিকাজের ছবি তুলে ধরল। ব্যক্তিগত কৃষিকাজের সঙ্গে সমষ্টিগত কৃষিকাজের তুলনা করবার একটা সুযোগ পেল সাধারণ কৃষকরা। কারা কম পরিশ্রমে বেশী ফসল উৎপন্ন করছে, কারা বেশী প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করছে? সাধারণ কৃষকরা উঁকি মেরে মেরে দেখল, গোপনে এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করল, ঈর্ষা করল যৌথ খামারের ঐশ্বর্য দেখে! ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট

পার্টির সপ্তদশ অধিবেশনে কমরেড স্টালিন বলেন—"আদর্শস্থানীয় গির্জা এবং সম্মুখপটে ধনী কৃষক, পাদ্রী ও পুলিশদের বড় বড় প্রাসাদ ও পশ্চাৎ পটে কৃষকদের আধ-ভাঙা জরাজীর্ণ কুঁড়ে-ঘর পরিবেষ্টিত পুরনো গ্রামগুলি ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় গড়ে উঠছে নতুন গ্রাম, বড় বড় বাড়ী, ক্লাব, বেতার, চলচ্চিত্র, স্কুল, গ্রন্থাগার ও শিশু-সদন, এবং ট্রাকটর, কম্বাইন, মাড়াইকল ও অন্যান্য যন্ত্র। গ্রামের এক সময়কার নামকরা প্রতিপত্তিশালী শোষণকারী ধনী কৃষক, রক্তশোষক মহাজন, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও 'ক্ষুদে বাপ' পুলিশরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যৌথ খামার, সরকারী খামার, স্কুল ও ক্লাবের নেতৃস্থানীয় কর্মী, ট্রাকটর ও কম্বাইনের প্রধান চালক, গো-মেষ পালন কেন্দ্রের কর্মী এবং যৌথ খামারের 'শক-ওয়ার্কার'—এখন এরাই হল গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি।"

কমরেড স্টালিনের বক্তৃতা থেকে কৃষিসমাজের বিশাল পরিবর্তনের ছবি চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সমাজগঠনের প্রাণস্পন্দন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৩৮ সালে শতকরা প্রায় ৯৯·৩ ভাগ কৃষিক্ষেত্র যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত হল। ট্রাকটর, কম্বাইন, মাড়াই কল, ডাইনামো ও যানবাহনের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল প্রত্যেকটি গ্রাম। কানে এল নতুন জীবনের কলোচ্ছ্বাস।

কৃষিক্ষেত্রের সমগ্রীকরণ মেয়েদের জীবনেও এক ব্যাপক পরিবর্তন আনলো। জারের আমলে আইনকানুন ও সামাজিক প্রথার শিকল লাগানো ছিল তাদের সর্বাঙ্গে। কৃষক-মেয়েদের মাঠে ও বাগানে ভয়ানক পরিশ্রম করতে হতো, গরুবাছুর দেখাশোনা এবং সাংসারিক সমস্ত কিছু কাজকর্মই করতে হতো। বাড়ীর কর্তাই ছিল তাদের একচ্ছত্র মালিক ও স্বামীর মারাপিট ছিল তাদের দৈনন্দিন পুরস্কার। অশিক্ষা, সাধারণ জ্ঞানের অভাব এবং অত্যাচার, পুরনো রাশিয়ায় এই ছিল কৃষক-মেয়েদের ছবি।

যৌথ কৃষিব্যবস্থা তাদের জীবনে এক ব্যাপক মুক্তির আস্বাদ আনলো। পুরুষের সমান নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেল তারা। যৌথ খামারে কাজ অনুযায়ী পুরুষের সমান বেতন ধার্য হল তাদের জন্যে! ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম কৃষক-মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের অধিকারিণী হল। এবার কৃষক-মেয়েরা যৌথ খামারে কী কী কাজ করে দেখা যাক। ১৯৩০-৩২ সালে অল্পসংখ্যক মেয়ে খামারে কাজ করত, তাও বিশেষ করে ফসল-বোনা ও ফসল-কাটার সময়ে। ১৯৩২ সালের হিসাব থেকে দেখা গেছে যে বড় জোর শতকরা ২০-৪০ ভাগ মেয়ে খামারের কাজে নিযুক্ত ছিল, তাও আবার সারা বছর নয়। বাকী মেয়ে খামারের কাজকর্ম নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাত না। উপরোক্ত যে বিশ-চল্লিশ ভাগ মেয়েরা কাজ করত, তারা ছিল আনাড়ী কর্মীদের পর্যায়ে। মাঠের সাধারণ কাজগুলি তাদের দেওয়া হতো। ট্রাকটর কি অন্যান্য যন্ত্র চালানোর কাজে পুরুষরাই ছিল অগ্রণী। কারণ তখনও মেয়েরা যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে কিছুমাত্র শিক্ষা পায়নি। এমন কি দুধের ব্যবসায় ও গো-মেষ পালনের কাজেও মেয়েরা খুব সামান্য অংশই গ্রহণ করত। পুরুষরাই দেখা শোনা করত গরু বাছুর। আবার তারাই যেত হাটে বাজারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত মেয়েরা কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ সময়ে খামারে কাজ করত এবং তাও 'আধা-কাজ-জানা' বা 'কাজ-না-জানা' মজুরের কাজ। খামারের আপিস চালনা বা হিসাব লেখার কাজেও অত্যন্ত মুষ্টিমেয় মেয়ে কাজ করত।

কিন্তু মেয়েদের এই শৈথিল্য বেশী দিন স্থায়ী হল না। ১৯৩৪-৩৫ সালে সমস্ত কৃষিসমাজ জুড়ে এল এক নতুন স্রোত। প্রত্যেক খামারে দেখা দিল গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি। আরো বেশী বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ করার ফলে খামারগুলি দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর খাড়া হল; মানুষের সংগঠন-ক্ষমতা বাড়ল। কি ট্রাকটর কি কম্‌বাইন কোন যন্ত্র চালাবার জন্যেই লোকের অভাব রইল না।

এই গুণগত ও পরিমাণগত সমৃদ্ধি মেয়েদের খামারের কাজে আকর্ষণ করল গভীরভাবে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন উৎসাহের আতিশয্যে মেয়েরাও

যৌথ খামারের কাজে তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে সচেষ্ট হল। আর শতকরা ২০-৪০ ভাগ মেয়ে নয়, ১৯৩৪-৩৫ সালে ৮০-৮৫ ভাগ মেয়ে খামারের কাজে আত্মনিয়োগ করল। মেয়েদের এই যোগদানের পেছনে আর একটা বড় কারণ আছে, সে কারণ হল সাধারণ ভোজনাগার। ফসলের সময় রাষ্ট্র থেকে যৌথ খামারের কর্মীদের জন্যে আহারের ব্যবস্থা করার ফলে মেয়েরা ঘরের কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেল। তাছাড়া অস্থায়ী শিশু-সদন ও কিণ্ডারগার্টেন গঠনের ফলে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষার দায়িত্বও সাময়িকভাবে সেই সংগঠনগুলির ওপর ন্যস্ত হল। এই অস্থায়ী সংগঠনগুলি বিশেষ করে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয় অর্থাৎ যে সময়ে সকলে খামারের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে। এই কয়েক মাস সাধারণ ভোজনাগার খামারগুলিতে ব্যাপকভাবে আহার্য পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ১৯৩৫ সালে সারা সোভিয়েট দেশে দশ লক্ষ পাচক কৃষি-ভোজনাগারে নিযুক্ত ছিল। পাচকের সংখ্যা থেকেই এর বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যাবে। কয়েক বছরের মধ্যে মেয়েদের কাজের স্তর অপ্রত্যাশিতভাবে উন্নতি লাভ করেছে। কৃষিশালাগুলিও সমস্ত রকম আধুনিক সাজসজ্জা ও যন্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। নীচের সংখ্যাগুলির আপেক্ষিক বিচার থেকেই যন্ত্রশিল্পের অবিশ্বাস্য উন্নতির হিসাব পাওয়া যাবেঃ—

	১৯৩৩	১৯৩৮
ট্রাকটর স্টেশন	২,৯১৬	৬,৩৫৬
ট্রাকটর-যন্ত্র	১,২৩,০০০	৩,৯৪,০০০
শস্যচ্ছেদক যন্ত্র	১০,৪০০	১,২৭,৫০০
শস্যবাহী-লরী	১২,৩০০	৯২,৬০০

নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের কাজের ধারা ও মনোবৃত্তি যে পরিবর্তিত হবে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ নতুন যন্ত্র ও নতুন বৃত্তিই হল কৃষিকাজের গতি নিয়ন্তা। প্রত্যেকটি কর্মীই আজ শিক্ষিত, প্রত্যেকটি যন্ত্রই আজ বৈজ্ঞানিক। আজ থেকে পনের বছর আগে (১৯৩৫ সালে) ৫,৫০,০০০ ট্রাকটর-চালক, ৬৪,০০০

৩

কম্‌বাইন-চালক, ৬৮,০০০ মোটর-চালক এবং ৭০,০০০ যৌথ-খামারের কর্মী—সারা সোভিয়েট দেশে এরাই ছিল কৃষিশালার প্রধান শক্তি। এবং এই সাড়ে সাত লক্ষ কর্মী কিছু দিন আগে পর্যন্ত সাধারণ কৃষক ছিল। ট্রাকটর, কম্‌বাইন ইত্যাদি যন্ত্র ছিল তাদের কাছে রূপকথার গল্প। আগেই বলা হয়েছে যে বারো-তেরো বছর আগে পর্যন্ত মেয়েদের আনাড়ী শ্রমিকদের দলে কাজ করতে দেওয়া হতো। আজ কিন্তু তারা কৃষি-সমাজের ভেতর একটা বড় স্থান জুড়ে রয়েছে। আগে মেয়েদের সম্বন্ধে অদ্ভূত সব ধারণা ছিল পুরুষদের মনে! মেয়েরা ট্রাকটর, কম্‌বাইন চালাতে পারবে, বড় বড় খামার পরিচালনা করে 'শক-ওয়ার্কার'-এর মর্যাদা পাবে...এ কথা সহজে বিশ্বাস করত না তারা। অন্দরমহলের নিরীহ মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা করুণার ভাব জেগেছিল সমস্ত স্ত্রী-জাতির ওপর। শুধু পুরুষরাই নয়, অনেক বয়স্থা স্ত্রীলোকও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে এ সব কাজ মেয়েদের জন্যে নয়। মেয়েরা অন্য ধাতু দিয়ে গড়া, মেয়েদের জীবনের উদ্দেশ্যও ভিন্ন। সুতরাং ঘরেই তাদের একমাত্র বিস্তৃতি। এই পুরনো সংস্কার কাটতে সময় নিল। কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ সালে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল সবাই যে মেয়েরা মাঠে মাঠে ট্রাকটর, কম্‌বাইন চালাতে শুরু করেছে। এমন কি ১৯৩৪ সালে একদল মেয়ে ট্রাকটর-চালক পুরুষদের কাজে হারিয়ে দেয় এবং পরে সেই পুরুষরা মেয়েদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে।

পশ্চিম সাইবেরিয়ার টালভ্‌স্কি ট্রাকটর স্টেশনের অধিনায়িকা ভি, এম বারন্‌দিনার কৃতিত্ব এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৬ সালে সে যৌথ খামারে যোগ দেয় এবং ১৯৩১ পর্যন্ত সাধারণ মজুরনীর কাজ করে। ১৯৩১ সালেই সে প্রধানা ট্রাকটর-চালকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। যৌথ কৃষিকর্মীদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলে—"প্রথমে লোকে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল কিন্তু বসন্তকালে আমি নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে সফল হলাম। সাধারণতঃ সবাই ১৮৮ হেক্‌টেয়ার জমি ট্রাকটরে চষে থাকে কিন্তু ৩৬০ হেক্‌টেয়ার জমি চষে আমি জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলাম।"

শুধু এই-ই নয়, বারন্‌দিনার সমস্ত জীবনই একটা সাফল্যের ইতিহাস। সে কারণে জনসাধারণ তাকে সোভিয়েট সরকারের সবচেয়ে বড় সংগঠন সারা ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিতে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন করে।

এই সময়ে মেয়েদের গো-পালনের কাজেও আগ্রহ নিতে দেখা যায়। আগে একেকটি মেয়ে পনেরটি গরু দেখাশোনা করত, এখন এক সঙ্গে সাতাশটি গরু দেখাশোনা করতে লাগল। ডেয়ারী ফার্মগুলি উন্নতি-লাভ করতে লাগল উত্তরোত্তর। তিন বছরের মধ্যে মেয়ে কর্মীর সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণের বেশী হল—৩,০২,৩০০।

কৃষিসমাজে নতুন মর্যাদা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ আরও বৃদ্ধি পেল। ১৯৩৩ সালের গোড়ার দিকে উত্তর ককেশাসের যৌথ খামারের মেয়ে-কর্মীরা স্টালিনের কাছে এক চিঠিতে লেখে, "এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যৌথ কৃষিব্যবস্থা আমাদের কোন্ পথে নিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার তাৎপর্যও আমরা অনুধাবন করেছি। গ্রামের খামারগুলির কর্মীদের মধ্যে এক অদ্ভুত কর্মচাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা লক্ষ্য করতে পারছি...দেখছি মেয়েরা দলে দলে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে এবং কাজের মধ্যে এগিয়ে আসছে।"

১৯৩৫ সাল সোভিয়েট কৃষিমেয়েদের জীবনে এক অপূর্ব জয়যাত্রা আরম্ভের বছর। এই বছরে যে পাঁচশো মেয়ে বীটপালঙের ফসল বৃদ্ধির অভিযানে বার হয়েছিল, তাদের কথা আগেই জানিয়েছি। এই অভিযানের অধিনায়িকা ছিল মেরিয়া ডেমচেংকো। মেরিয়া একজন গরীব চাষীর মেয়ে। প্রথম থেকেই তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কৃষি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই সে সমাজতান্ত্রিক কৃষি আন্দোলনের পুরোভাগে যোগ দেয়। ১৯৩৪ সালে তার দল আড়াই একর জমিতে ৪৬,৯০০ পাউন্ড বীট ফলাতে সমর্থ হয়। পরের বছর যৌথ খামারের শক্-ওয়ার্কারদের দ্বিতীয় অধিবেশনে মেরিয়া ডেমচেংকো প্রতিজ্ঞা করে যে আড়াই একর জমিতে তারা পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড বীট ফলাবেই। সে এবং তার দল এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল। কিন্তু

অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তার জন্যে। বসন্তকালে এত তুষার পড়ল যে অর্ধেকের বেশী বীজ নষ্ট হয়ে গেল। গ্রীষ্মকালে দেখা দিল অনাবৃষ্টি। ১০৬ দিন ব্যাপী এক বিন্দু বৃষ্টির দেখা নেই। তারপর ফসল নষ্ট করতে এল কীট পতঙ্গ। কিন্তু অধ্যবসায়, অমানুষিক পরিশ্রম ও কৃষি-বিজ্ঞানের সাহায্যে তারা সমস্ত বাধা জয় করতে সমর্থ হল। ১৯৩৫ সালেই তারা আড়াই একর জমিতে ৫২,৪৫৪ পাউন্ড বীটপালঙ উৎপন্ন করে সমস্ত সোভিয়েট দেশকে সচকিত করে দিল। এই সাফল্যই মেরিয়া ডেমচেংকোর প্রধান কৃতিত্ব নয়, তার কৃতিত্ব হল সাধারণ মেয়েদের এই বিশাল আন্দোলনের মাঝখানে টেনে আনা। এবং তার সহকর্মীরাই একদিন তাকে অতিক্রম করে চলে গেল। বীট উৎপাদনকারী এলাকার হাজার হাজার চাষীরা এখন মেরিয়া ডেমচেংকোর সঙ্গে দেখা করতে আসে বা চিঠি লেখে। কৃষি-বিজ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠ ফসলফলনের প্রধান হাতিয়ার—এই হাতিয়ারের ওপরই জোর দেয় মেরিয়া। কারণ "কৃষি-বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া বীটের ফসলও ভালো হবে না এবং তাতে চিনির পরিমাণও যথেষ্ট থাকবে না। তোমরা খামারের উন্নতির জন্যে মন প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করো, কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশোনা করো, খামারে আপনিই ভালো ফসল ফলবে।"

সোভিয়েটের কৃষক-মেয়েরা শুধু যে ট্রাকটর চালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে তাই নয়। কম্‌বাইনের মত জটিল যন্ত্র চালাতেও শিখেছে তারা। ১৯৩৫ সালে কম্‌বাইন পিছু ৪০০-৪৫০ একর জমি তৈরী করা যেত। সে জায়গায় আমেরিকায় একজন চাষী ৫৭৭½ একর জমি তৈরী করিতে পারত। কিন্তু ১৯৩৫ সালেই সোভিয়েট দেশের কৃষক-মেয়েরা আমেরিকার রেকর্ড অতিক্রম করে বহুদূর এগিয়ে যায়। সারাটভ্ জেলার মেরিয়া পেট্রোভা ১,৩৬০ একর জমি প্রস্তুত করে; নিপ্রোপেট্রভ্‌স্ক্ জেলার এভডোকিয়া ভিনিক করে ১,২০২½ একর জমি; সেই জেলারই আরেকটি মেয়ে সুখিনা করে সকলের বেশী—১,৮২০ একর জমি। এই অদ্ভুত কৃতকার্যতা থেকে প্রমাণিত হয় যে মেয়েরা পুরুষের তুলনায় কোন অংশে ছোট নয়। সোভিয়েট দেশের মত সমস্ত দেশের মেয়েরাই তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে যদি

বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্ধ কুঠরি থেকে মুক্তি পায় তারা। কারণ এই কম্‌বাইনের মত জটিল যন্ত্র মেয়েরা চালাতে পারবে এ কথা ভাবতেই পারত না কৃষকরা। সবেমাত্র ১৯৩০ সালে যৌথ খামারের মাঠে তারা দেখতে পেয়েছিল এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্র।

বীটের ফসল বৃদ্ধির ব্যাপারেই যে মেয়েরা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তাই নয়, শন তৈরীর কাজেও তাদের কর্মনিষ্ঠা সত্যিই কৌতূহলপ্রদ। পৃথিবীর যে সব দেশে বিপুল পরিমাণ শন উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে সোভিয়েট দেশ হল অন্যতম। সেখানে সাধারণত একটি লোক দিনে ১৭ পাউন্ড শনের আঁশ তুলত। ১৯৩৫ সালে অক্টোবর মাসে আনা ভিরোব্‌য়েভা ৭৫ পাউন্ড শনের আঁশ তুলতে পেরে সবাইকে আশ্চর্য করে দেয়। তার নেতৃত্বেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। তার পরেই যৌথ খামারের চাষী—রাসোজিনা ও রোগোসিনা যথাক্রমে ২৪২ ও ২৪৪ পাউন্ড আঁশ উৎপাদন করে।

স্টাখানোভ আন্দোলনের পেছনে রয়েছে এক নতুন পদ্ধতির শিক্ষা ও প্রেরণা। শনের আগামী ফসলের পরিকল্পনা করা কালে যৌথ খামারের এক কৃষক-মেয়ে মলিয়াকোভ বলে—“আমরা প্রত্যেকটি বিষয় চিন্তা করেছি এবং কৃষি-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছি। আমরা সমস্ত ভালো রাসায়নিক সারদ্রব্য ব্যবহার করেছি; বৈজ্ঞানিক মতে জমি পছন্দ করেছি। আর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বীজ বাছাই করেছি যাতে একটা দাগওলা বীজও না থাকে।” এই পদ্ধতি ও এই বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়েটির সঙ্গে জারের যুগের একটুখানি তুলনা করে দেখলে দেখা যাবে যে এক তিমিরাবৃত জনপদের ওপর নতুন সূর্যের আলো এসে ঝলসিয়ে উঠেছে।

গো-পালন সম্বন্ধে এখানে দু-একটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে। ‘রেড ডন’ যৌথ কৃষিশালার নাদেজ্‌দা পারসিয়ান্টসেভা ও কাথারিন নারটৌভাই গো-পালনে প্রথম স্টাখানোভ আন্দোলন শুরু করে। আগে সাধারণতঃ সোভিয়েট ইওরোপে বছরে একটি গরু প্রতি ২৪৫ গ্যালন (১,১০০ লিটার) দুধ পাওয়া যেত। এদের নেতৃত্বে আন্দোলন হওয়ার ফলে গরু পিছু ৬৬৭ গ্যালন (৩,০০২ লিটার) দুধ পাওয়া গেল। অন্যান্য

খামারের মেয়েরা অত্যন্ত খুশি হল এদের ফলাফল দেখে। জার্মান ভল্‌গা রিপাব্‌লিকের খামারের একটি মেয়ে ই, ক্রাউবার্জার তার ছয়টি গরুর প্রত্যেকটি থেকে বাৎসরিক ৯৮৩ গ্যালন দুধ আদায় করতে সমর্থ হল। সমস্ত দেশে আলোড়ন পড়ে গেল এই নিয়ে। এই জার্মান মেয়েটির সাফল্য খামারের প্রত্যেকটি মেয়েকে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় এক নতুন অনুপ্রেরণা জোগাল। এবং একদিন ঐ জার্মান মেয়েটিকে অতিক্রম করে তাসিয়া প্রোকোভ্‌য়েভা সবার সামনে এক নতুন রেকর্ড উপস্থিত করল। একটি দুটি নয়, তার খাটালের প্রত্যেকটি গরুর থেকে সে বাৎসরিক ১,৩৯৮ গ্যালন দুধ পেতে সফল হল; প্রতিযোগিতায় তাসিয়াই অপরাজেয় আসনে বসবার সম্মান লাভ করল। এখানে বুঝে দেখতে হবে যে এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জনের পেছনে কোন যাদু নেই, কোন ভূত বা ভগবানের তপস্যা করেও এই বরপ্রাপ্তি ঘটেনি। মানুষ তার নিজের চেতনা, বাস্তববোধ, আত্মবিশ্বাস ও সমবেত চেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধার ফলেই তার প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী ফলাফল সৃষ্টি করতে পেরেছে।

খামারের প্রত্যেকটি কাজকর্মে মেয়েদের কৃতিত্ব প্রমাণিত হওয়ায় তারা খামার পরিচালনার ব্যাপারেও বড় বড় পদের অধিকারিণী হয়েছে। কমিটির সভ্যা, সভানেত্রী, সহ সভানেত্রী, দলের অধিনায়িকা এমনি কত উচ্চ সম্মানে মেয়েরা আজ সম্মানিতা। বর্তমানে সম্মানিতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং দায়িত্বশীল কাজে মেয়েরা কখনও অযোগ্যতার পরিচয় দেয়নি।

এবার গ্রামে শিক্ষাদীক্ষা প্রসারের কথা আলোচনা করা যাক।

জারের আমলে চাষীদের অবস্থা কোন্ স্তরে ডুবে ছিল তার কিছু পরিচয় আগে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার দিক থেকে তো সম্পূর্ণ অন্ধকারে তলিয়েছিল গ্রামাঞ্চলের লোকেরা। কিন্তু আজ সোভিয়েট দেশের সুদূরতম অঞ্চলে গিয়ে পেঁৗচেছে শিক্ষার আলো। মেয়েরা গিয়ে ভীড় করেছে ইস্কুলে, শিল্প শিক্ষালয়ে, শ্রমিকদের শিক্ষায়তনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৭ সালের আগে সারা রুশ দেশে মোট ৯১টি উচ্চ শিক্ষালয় ছিল যার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,১২,০০০ আর শহরে

এবং গ্রামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ইস্কুলে পড়ত এমনি ছেলেমেয়ের মোট সংখ্যা ছিল আটাত্তর লক্ষ। এই ছিল সারা রাশিয়ায় ইস্কুল-যাত্রী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা। সে জায়গায় সোভিয়েট সরকারের আওতায় ১৯৪০ সালে উচ্চ শিক্ষালয়ের ছাত্রদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,৫৪,০০০-এ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটিতে। ১৯৩৩-৩৪ সালে মোট ৬০,৪০০ ক্লাবের মধ্যে ৫০,৯০০টি ছিল গ্রামাঞ্চলে। এ থেকে পৃথিবীর লোক কী বুঝবে? বুঝবে এক-একটি গ্রাম হল সোভিয়েট ইমারতের এক-একটি ইট। কারণ গ্রামের অর্থনৈতিক বনিয়াদের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির ভিতও গাঁথা হয়েছে মজবুত করে। আজ প্রত্যেকটি গ্রামে সিনেমা, থিয়েটার, ক্লাব, গ্রন্থাগার, বৈদ্যুতিক আলো, রেল লাইন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে। সোভিয়েট গ্রামগুলি একেকটি ছোট ছোট শহর হিসাবে গড়ে উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে আর কাউকে কষ্ট ভোগ করতে হয় না। মেয়েরা জীবনে এই সর্বপ্রথম শিক্ষিত জীবনযাপনের সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। আগের দিনে তারা ইস্কুল কলেজ, বই পত্র, আমোদ প্রমোদ সব কিছুর আস্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল। তার ওপর তাদের অনেকেই ছিল দরিদ্র, নিগৃহীত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সমানে তাদের পেটের ধান্ধায় ঘুরতে হতো। জীবিকাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করবার অবসর পেত না তারা। যৌথ খামারের ফলে অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনে বিকাশ লাভ করেছে এক নতুন চেতনা। বালির নীচে ঢাকা পড়ে শুকিয়ে গিয়েছিল যে জলধারা তা আবার প্রাণচাঞ্চল্যে স্রোতস্বিনী হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের তরফ থেকে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান করে দেখা হয় যে কৃষকরা কী ভাবে সময় কাটাচ্ছে......কতটা সময় তারা কাজে ব্যয় করে এবং কতটা সময় বিশ্রাম করে। এই সংখ্যা থেকে সোভিয়েট কৃষিজীবনের এক দিককার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। ১৯২৩ সালে সোভিয়েট দেশে যৌথ কৃষিপ্রথা প্রবর্তিত হয়নি। তখনও কৃষকরা নিজেদের ছোট ছোট জমিতে আলাদা আলাদা ভাবে চাষ করছিল। সে সময়ে বিস্তৃত খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় চাষীরা

নিম্নলিখিতভাবে ব্যয় করতঃ—

ক্ষেতের কাজকর্ম	১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট
ব্যক্তিগত বা সাংসারিক কাজ	২ " ৫৬ "
বিশ্রাম	৩ " ১৫ "
নিদ্রা	৫ " ৫৮ "

১৯২৩ সালে একজন বিবাহিতা কৃষক-মেয়ে কী ভাবে সময় ব্যয় করত তার খবর আরেকটি হিসাব থেকে পাওয়া যায়। তখন প্রয়োজন মত ঘুমোবার সময় পর্যন্ত পেত না তারা। নীচের সংখ্যাগুলি ভালো করে বিচার করে দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবেঃ—

ক্ষেতের ও সংসারের কাজ	১৫ ঘণ্টা ৫১ মিনিট
বিশ্রাম	৫ " ৪৩ "
নিদ্রা	২ " ২৬ "

১৯৩৬ সাল। তখন শতকরা নিরানব্বুই ভাগ জমি যৌথ-প্রথায় চাষ হচ্ছে। সারা দেশ সরগরম হয়ে উঠেছে যন্ত্রের কোলাহলে ও মানুষের পদশব্দে। সে সময়ে অনুসন্ধান করে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় সাপেক্ষিক বিচারের জন্যে সেগুলি নীচে দেওয়া গেলঃ—

ক্ষেতের কাজকর্ম	৮ ঘণ্টা ২৩ মিনিট
ব্যক্তিগত বা সাংসারিক কাজ	২ " ২৪ "
বিশ্রাম	৫ " ২৭ "
নিদ্রা	৭ " ৪২ "

১৯২৩ আর ১৯৩৬। ওপরের তথ্যগুলোকে তুলনামূলক বিচারের মাপকাটিতে ফেললেই বোঝা যাবে সোভিয়েট দেশ কোন্ দিকে মোড় নিয়েছে। ১৯২৩-এর তুলনায় বর্তমানে কৃষকরা কী পরিমাণ সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বিচারের ব্যারোমিটারেই তা ধরা পড়বে। আজ অনেক বেশী বিশ্রাম পাচ্ছে সোভিয়েট চাষীরা। এই বিশ্রামের সময়ে তারা পড়াশোনা করে, সামাজিক কাজকর্ম করে, থিয়েটার সিনেমা দেখে, আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দেয়। গ্রীষ্মকালে আরও কম পরিশ্রম করে বলে সবাই আরও বেশী বিশ্রাম পায়।

সোভিয়েট কৃষিসমাজের বিশাল পরিবর্তন থেকে একটা জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নজরে পড়ে যে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সমস্ত পার্থক্য সোভিয়েট দেশে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের প্রসার, যন্ত্রের অগ্রগতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—এগুলি শহর ও গ্রামের মধ্যবর্তী প্রাচীরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। অর্থাৎ এই দুয়ের মধ্যে যে ফাঁক আর ফাঁকি তা ভরাট করে দিয়েছে সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা। বহু যুগ যুগান্ত ধরে শহর ও গ্রামের মধ্যে সংঘর্ষ, বিদ্বেষ ও ঘৃণায় যে শক্তি অপচয় হচ্ছিল বর্তমানে তার সত্যিকার মীমাংসা সম্ভব হয়েছে। আজ আর গ্রামের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে শহরের লোকেরা তামাসা করে না, তাচ্ছিল্য করে না। ফাঁক আর ফাঁকি, কোন অসঙ্গতিই আজ আর গ্রাম্য জীবনে অবশিষ্ট নেই।

যৌথ কৃষিসমাজে এক কোটি নব্বুই লক্ষ কৃষক-মেয়ে হল একটা বিরাট সামাজিক শক্তি। তাই এই মেয়েদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্টালিন এক জায়গায় বলেছেন "যৌথ কৃষিকাজ নারীজাতিকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তার অধিকার দিয়েছে। আজ আর সে মেয়ে হিসেবে তার বাপের জন্যে বা স্ত্রী হিসাবে তার স্বামীর জন্যে কাজ করছে না, সে কাজ করছে সর্বাগ্রে তার নিজের জন্যে। এই হল কৃষক-মেয়েদের মুক্তির গোড়ার কথা। এই হল যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব যা একজন মেয়েকে একজন পুরুষের সঙ্গে সমান ভিত্তিতে দাঁড়াবার অধিকার দিয়েছে।"

জাতিগঠন ও শাসনকার্যে— মেয়েদের স্থান

সোভিয়েট দেশে মেয়েদের দক্ষতা অর্জন করার জন্যে প্রথমেই টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর পর দক্ষতার ক্ষেত্র আরও বিরাট, আরও প্রশস্ত। কারণ প্রাথমিক টেকনিক্যাল শিক্ষা পাওয়ার পর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা চলতে পারে। ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিশিয়ান, ফোরম্যান, কৃষিবিদ, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানের কত রকম শাখা প্রশাখা...যে কোন দিকে মেয়েদের পারদর্শিতা প্রমাণের পথ খোলা আছে।

মাধ্যমিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ শিক্ষা পেয়ে থাকে। কিন্তু এমন অনেক কল-কারখানায় আছে যেখানে সাধা-রণ শ্রমিকরা বিশেষ রকম শিক্ষা না পেয়েই নিজেদের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে এবং উচ্চ পদে উন্নীত হয়েছে। এই সব কর্মীদের জন্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র তত্ত্বগত শিক্ষার সুবিধা করে দিয়েছে যাতে তারা আরও উন্নতি করতে পারে।

বুদ্ধিজীবী জগতে সোভিয়েটের মেয়েরা কতটা অংশ গ্রহণ করে তা জানবার জন্যে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে কৌতূহল থাকা স্বাভা-বিক। সোভিয়েট মেয়েরা কি ইঞ্জিনীয়ারিং বা টেকনিক্যাল বিদ্যায় পারদর্শিনী? মাধ্যমিক ও উচ্চ স্কুলে মেয়েদের পড়বার জন্যে কি বিশেষ কোন ব্যবস্থা আছে? এমনি কত প্রশ্ন তাদের মনে উঁকি দেয়।

জারের আমলে শিক্ষার দরজা ছিল মেয়েদের জন্যে প্রায় বন্ধ। মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করবে—এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। ১৯০৫ সালের পর অবিশ্যি মেয়েরা কিছু সুবিধা আদায় করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মাত্র তিনটি উচ্চ শিক্ষা-লয় ছিল সারা রুশ সাম্রাজ্যে, মস্কোতে একটি ও পিটার্সবুর্গে দুটি—

প্রথমটি সাধারণ স্কুল ও দ্বিতীয়টি মেডিক্যাল স্কুল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নারী জাগরণের স্রোত আরও ব্যাপক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। শিক্ষা রাজধানীর গণ্ডি ছাড়িয়ে তাই ওডেসা, খারকভ, কিয়েভ, কাজান ও অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করল। ১৯০৯ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে এমন ছাত্রীর সংখ্যা হল ৫,৭৭০। তাও সাধারণ স্কুলশিক্ষা, কোন রকম বিশেষ শিক্ষা নয়। বিশেষ শিক্ষার মধ্যে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক ছাত্রী চিকিৎসা-শাস্ত্র, আইন-বিদ্যা ও কৃষি-বিদ্যা অধ্যয়ন করছিল।

প্রাক-বিপ্লব যুগের শিক্ষা সম্পর্কে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে সে যুগে কেবলমাত্র অর্থশালী পরিবারের মেয়েরাই স্কুলে যেতে পারতো। সাধারণ কৃষক বা শ্রমিক ঘরের ছেলে-মেয়েদের এমন কি উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের শিক্ষার খরচ জোগাবার সামর্থ্য ছিল না। যে সব মেয়েরা শিক্ষালয় থেকে লেখাপড়া শিখে বের হতো তারা শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেত। কারণ সে সময়ে অল্প বেতনে শিক্ষয়িত্রীর কাজ সংগ্রহ করা এমন কিছু দুঃসাধ্য ছিল না। ১৯১২ সালে একমাত্র মস্কো শহরেই শতকরা ৬৪ জন ছিল শিক্ষয়িত্রী অর্থাৎ সংখ্যায় সাড়ে দশ হাজার। এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। এ ছাড়া শতকরা ১৫ জন ছিল ডাক্তার আর বাকী যারা তারা ছিল নার্সের কাজে বা আরও ছোটখাটো কাজকর্মে। এ হল রাজধানীর অবস্থা। মফস্বল শহরে মেয়েরা এ ধরনের কাজ বড় একটা করত না বললেই চলে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যখন পুরুষরা যুদ্ধের ময়দানে সৈন্য হয়ে চলে গেল তখন মেয়েদের নানা কাজকর্মে গ্রহণ করা হল। লোকজনের ভয়ানক অভাব, সুতরাং সে সময়ে মেয়েদের এ সুযোগ না দিয়ে শাসকদের কোন গত্যন্তরও ছিল না। অন্যদিকে মেয়েরাও এই ফাঁকে বৃহত্তর কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পেরে তাদের ক্ষমতা প্রকাশের সুবিধা পেল। তারপর এল সমস্ত কিছু পরিবর্তনের পালা। বিপ্লবের সম্মার্জনীতে সমাজের যত সব অন্যায় অসাম্য ঝেঁটিয়ে দূর হয়ে যাবার জোগাড় হল। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সমস্ত রকম বাধা-নিষেধের দেওয়াল চূর্ণ করে মেয়েদের জন্যে

খুলে দিল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রবেশপথ। সমাজের অভুক্ত, অশিক্ষিত কিশোরীদের ডাক এল শিক্ষালয় থেকে। সেদিন আর পয়সাওয়ালা লোকেদের ছেলেমেয়ে নয়, সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের আঙিনা থেকে হাজার হাজার শিক্ষা-গ্রহনেচ্ছু ছেলেমেয়েরা জড়ো হল স্কুলের আশে পাশে। বৃহত্তর পৃথিবীকে চেনবার ও জানবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল মানুষের মন। সাধারণ শিক্ষালয়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল বিশেষ রকম স্কুল যেখানে কেবলমাত্র চাষী মজুরের ছেলে-মেয়েরাই পড়বে। এই রকম ইস্কুলগুলিকে বলা হতো র‍্যাবফ্যাক (Rabfak) অর্থাৎ ওয়ার্কার্স ফ্যাকাল্টি। এখানে তিন-চার বছরের কোর্সের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষা দেওয়া হতো। এবং দেখা গেছে এই শিক্ষা সোভিয়েট সমাজে এক নতুন ধরনের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে।

১৯২৬ সালের তথ্য ঘাঁটলে দেখা যায় যে তখন সোভিয়েট রাষ্ট্রচালনার কাজে ও টেক্‌নিক্যাল কাজেকর্মে মেয়েরা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে বসেছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে	১৬,০০০
টেকনিক্যাল কাজকর্মে	৭,০০০
কৃষিবিদের কাজে	৭০০
আইনজ্ঞের কাজে	৮০০

আসলে কিন্তু একটা বিরাট উন্মাদনা চোখে পড়ল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে। এই পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার জন্যে ডাক পড়ল দেশের বৃহত্তর মানুষের কারণ প্রত্যেকটি নারী পুরুষের সহযোগিতা ব্যতীত এই অতিকায় পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা কোন দিনই সম্ভব ছিল না। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিজেদের সমস্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বোধ বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে এসেছিল বলেই সফল হয়েছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। অন্য কোন পুঁজিবাদী দেশে এমনি মানবিকতা বোধ, সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও যৌথ সহযোগিতা সম্ভব নয়। কারণ যে দেশের মানুষ জাতিতে জাতিতে বিচ্ছিন্ন, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত,

ধর্ম ও বর্ণ বিদ্বেষে আচ্ছন্ন, অর্থের পরিমাণ বিচারের ওপর যে দেশে মানুষের উচ্চ নীচতা নির্ভরশীল, সে দেশে কি করে জন্ম নেবে এই নতুন চেতনা? যে দেশের অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না, চিকিৎসার অভাবে হাজারে হাজারে মারা যায়, বস্তিজীবনই যাদের কাছে শ্রেষ্ঠ জীবনযাত্রার নমুনা, বেকারীর বিভীষিকায় ভীত মানুষ যে দেশে কারখানার দোর থেকে দোরে তাড়া খেয়ে বেড়ায়, সেদেশের মানুষ কিসের প্রেরণায় এগিয়ে আসবে যৌথ সহযোগিতার মধ্যে। কিন্তু সোভিয়েটের মেয়েরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়েছিল কারণ তারা বুঝেছিল যে সমাজের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে তারা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফলের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ মিলবে। পাঁচ বছরের মধ্যে মেয়ে-কর্মীর সংখ্যা কী ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার খবর নীচে দেওয়া গেলঃ—

	১৯২৮-এর শেষে	১৯৩৩-এর গোড়ায়
মেয়ে-ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য সুদক্ষ কর্মী	১,৪৬,০০০	৩,৭৫,০০০
শিক্ষয়িত্রী	২,১১,৫০০	৩,৮৭,২০০
মেয়ে-চিকিৎসক	১,৩৫,৫০০	২,১১,০০০
	৪,৯৩,০০০	৯,৭৩,২০০

মোট সংখ্যা বিচার করলে দেখা যাবে যে শতকরা প্রায় একশো ভাগ কর্মী এই পাঁচ বছরের মধ্যে গড়ে উঠেছে যারা সত্যি সত্যিই জাতি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাব নিকাশ নিলে আরও অবাক লাগে। ১৯৩৩-এ যে মেয়ে ইঞ্জিনীয়ার ও সুদক্ষ কর্মীর সংখ্যা ছিল পৌনে চার লক্ষ, ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে তা হল পাঁচ লক্ষ। সংখ্যাগুলির দিকে চাইলে মনে হয় যেন মানুষ গড়া চলেছে বিদ্যুতিক গতিতে। যেন জ্ঞান-আহরণ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। কে আগে শিখবে, কে আগে মানুষ হবে, কে আগে তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ দেবে—এই নিয়ে একটা সুস্থ ও সবল

প্রতিযোগিতা।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতা সারা সোভিয়েট দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে দেখা দিল স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিল্প-শিক্ষালয়ে—কোথায় নয়? সর্বত্র মেয়েরা দলে দলে ভর্তি হওয়ার জন্যে আবেদন জানালো। শহরের মেয়েরা নয়, দূর দূর গ্রামের মেয়েরা যারা কিছু বছর আগে পর্যন্ত লেখাপড়ার কথা মনেও আনতে পারত না, তারা তাদের কাছাকাছি শিক্ষায়তনে গিয়ে উপস্থিত হল। যেন যাদুঘর দেখতে এসেছে, এমনি কৌতূহল এমনি বিস্ময় তাদের দু-চোখে, এমনি অপরিমেয় উন্মাদনা তাদের মনে!

কলকারখানায়, ক্ষেত খামারে, ট্রাম ও রেলগাড়ী চালনায়—শুধু এসব কাজকর্মেই নয়, রাষ্ট্রের পরিচালনা-যন্ত্রের মধ্যেও মেয়েরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অংশ গ্রহণ করল। আপিসের সমস্ত কাজকর্মে, বড় বড় দোকান—(সবগুলিই রাষ্ট্রের অধীন) পরিচালিকার পদে এবং রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা তাদের অনধিকৃত অধিকার দখল করে বসল।

রাসায়নিক গবেষণাগারে বিশেষ করে যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের গবেষণাগারে মেয়েরা তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। দেখিয়েছে রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যাপারে মেয়েরা পিছিয়ে নেই। তারাও চেষ্টা করলে বড় বড় রসায়নবিদ, বড় বড় বিজ্ঞানী হতে পারে। তাছাড়া ছোট ছোট কল-কারখানায় পরিদর্শকের কাজে মেয়েরাই হল অগ্রণী।

১৯৩৮ সালের একটা হিসাব পাঠকদের অবগতির জন্যে উদ্ধৃত করা হল:—

	শতকরা হিসাব	
	মেয়ে	পুরুষ
বড় বড় শ্রমশিল্পে (১৯৩৭)	৩৯·৮%	৬০·২%
বৈজ্ঞানিক গবেষণায়	৩৪%	৬৬%
বিশ্ববিদ্যালয়ে	৪৩·১%	৫৬·৯%
চিকিৎসা-শাস্ত্রে	৫০·৬%	৪৯·৪%
শিক্ষাজগতে	৬৪·৮%	৩৫·২%

ভারতবর্ষে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত মেয়েদের ভোট দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর প্রাণপণ চেষ্টায় এবং নারী আন্দোলনের চাপে ১৯২৩ সালে মন্‌টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম বিলে এদেশের মেয়েরা সর্বপ্রথম ভোট দেওয়ার অধিকার পায় এবং তাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবে। ১৯৪৬ সালের ভারতীয় নির্বাচনের হিসাব পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে শতকরা মাত্র চোদ্দ ভাগ মেয়ে 'ভোটার' হিসাবে সরকারী খাতায় তালিকাভুক্ত হয়েছিল। সোভিয়েট দেশে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই অন্য রকম। সে দেশে যে কোন মেয়ে যার আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে সে-ই নির্বাচনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে পারে এবং ভোট দিতে পারে। অর্থাৎ দেশ-শাসনে মেয়েদের অধিকার ও দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃত হয়েছে। সোভিয়েট দেশে যা "সর্বোচ্চ শাসন পরিষদ"—যাকে দেশের লোকেরা বলে সুপ্রীম সোভিয়েট, সেই পরিষদে মেয়ে ডেপুটির সংখ্যা হল ২৭৭ জন অর্থাৎ মোট সদস্য সংখ্যার এক পঞ্চমাংশেরও বেশী। এ সম্মান পৃথিবীর অন্য কোন্ দেশের মেয়েরা পেয়েছে?

সোভিয়েট সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছে যে রাজনৈতিক দল—সেই কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সদস্য সংখ্যা হল ৬৩ লক্ষ। তার মধ্যে মেয়ে-সদস্যের সংখ্যাই এক লক্ষেরও ওপর।

সবচেয়ে সভ্য, শিক্ষিত এবং নারী প্রগতির দেশ বলে যে দেশ গর্ব করে, সেই ইংলণ্ডেও প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মেয়েরা নির্বাচনের সময়ে কোন ভোট দিতে পারত না। সে কারণে মেয়েদের প্রচণ্ড আন্দোলন (যা সাফ্রেজিস্ট আন্দোলন বলে খ্যাত) চালাতে হয়। পুলিশের লাঠি, কারাবরণ, অনশন ও হাজার রকম অত্যাচার সহ্য করতে হয় তাদের সাধারণ ভোটের দাবী আদায় করবার জন্যে। প্রত্যেকটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ভোটের অধিকার স্বীকার করতে রাজী নয় পুঁজিবাদী দেশের শাসকরা। কারণ তারা জানে যে সাধারণ মানুষকে ভোট দেওয়ার অধিকার দিলে তাদের শাসন বেশী দিন টিঁকবে না। ভোটের অধিকার মানুষকে রাজনীতি-সচেতন করে তুলবে।

এই ভয়, এই আশঙ্কা সোভিয়েট দেশে নেই। কারণ তারা সে যুগ

উত্তীর্ণ করে নতুন এক যুগে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে যেখানে জনসাধারণই দেশের সব কিছুর মালিক।

সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় যে সব মেয়েরা উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে এখানে তাদের হিসাব নেওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম মহিলা-রাজদূত হলেন একজন রুশ মহিলা স্বগীয়া মাদাম কোলোন্টায়। ইনি বহুদিন সুইডেনে প্রতিনিধিত্ব করেন। সর্বোচ্চ শাসন পরিষদের সভাপতিদের মধ্যে দুজন হলেন সভানেত্রী। সোভিয়েট অব দি ন্যাশানালিটিজ-এর সহ-সভানেত্রী হলেন আজারবাইজানের মেয়ে আস্লানোভা। সুদূর মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে সভানেত্রী হিসাবে এসেছেন চুভাষ মেয়ে আন্দ্রিয়েভা, ইয়াকুট মেয়ে সিডোরোভা ও বারিয়াৎ-মঙ্গোল মেয়ে সাইজিনোভা। তাঁরা সবাই উপজাতির মেয়ে —জারের আমলে যে সব উপজাতিদের বলা হতো বন্য, মধ্যযুগের মানুষ।

সোভিয়েট দেশের ষোলোটি রিপাব্লিকের মধ্যে পাঁচটি হল সোভিয়েট এশিয়ার—যে এশিয়া বিপ্লবের আগে ছিল জারের উপনিবেশ—যে এশিয়া শোষিত ও নিপীড়িত হতো আমাদের ভারতবর্ষের মতই। এই এশিয়ার মেয়েরা ঢাকা থাকত 'পারাঞ্জা'র আড়ালে, বাইরে আত্মপ্রকাশ করার কোন অধিকার ছিল না তাদের। কিন্তু তাদের দেশেরই তুর্কমেন মেয়ে কেরেদ্জায়েভা হল তুর্কমেন সোভিয়েটের বিচার বিভাগের পিপ্ল্স্ কমিশার, তাদের দেশেরই খিরগিজ মেয়ে কারাকুলোভা হল খিরগিজ সোভিয়েটের বিচার বিভাগের সহকারী পিপ্ল্স্ কমিশার।

জারের আমলে শিক্ষিত মেয়েদেরও কি নজরে দেখা হত একটি ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ মিলবে। ১৯০৯ সাল। বিপ্লব-পূর্ব যুগের কথা। সে সময়ে একাটেরিনা ফ্লিশিট্জ্ নামে একটি মেয়ে আইন পাশ করে সহকারী এটর্নির পদে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বার এসোসিয়েশনে যোগ দেয়। এই নিয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয় সমস্ত রাশিয়ায়। একদিন না; অসাম্য ও দুর্নীতি যা ধনতন্ত্রী সমাজের সবচেয়ে বড় ব্যাধি তারও চিকিৎসা হতে পারে না। সোভিয়েটের মেয়েদের জয়যাত্রার কথা বলতে

গিয়ে তাই স্টালিন এক জায়গায় বলেছেন "ক্রমবর্ধমান সামাজিক কাজ-কর্মে শ্রমজীবী মেয়েদের যোগদানকে আমরা অভিনন্দন জানাই। উচ্চতর পদে পদোন্নতি থেকেই তাদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রমাণ মিলছে।"

নতুন জীবনের পথে

১৯৪১ সালের শেষ দিকে মাক্‌সিম লিট্‌ভিনফ্‌ সোভিয়েট সরকারের দূত হিসাবে ওয়াশিংটনে যান। তাঁর পৌঁছানোর কিছু দিন পরেই 'মেয়েদের জাতীয় গণতন্ত্রী ক্লাব' থেকে তাঁর স্ত্রীকে এক সংবর্ধনা সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সে এক বিরাট রাজকীয় আয়োজন! মাদাম লিট্‌ভিনফ্‌ বুঝলেন কোন্‌ শ্রেণীর অভিজাতদের নিয়ে এই ক্লাবের সংগঠন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাদাম লিট্‌ভিনফ্‌ বললেন, "এই সভায় এসে দেখছি যে এখানকার সমস্ত মেয়েদের 'ইনি অমুক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী' 'উনি তমুক ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত স্ত্রী' হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন কি আমাকেও তা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি! আমাদের রাশিয়ায় এ প্রথা অচল। সেখানে এই তথাকথিত 'সম্ভ্রান্ত' ব্যক্তি বলে কোন পদার্থ নেই। আমি একজন সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী বলে সেখানে কেউ আমার বক্তৃতা শুনতেও আসবে না। সোভিয়েট মেয়ের তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে যা তার নিজের কৃতিত্ব দিয়ে অর্জন করা; স্বামীর খ্যাতির ওপর তা নির্ভরশীল নয়।"

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে বিখ্যাত সোভিয়েট কথাশিল্পী—বোরিস গর্বাটভ-এর স্ত্রী নিনা আর্কিপোভা কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি একজন ক্যামেরা-শিল্পী। এক জায়গায় অটো-গ্রাফ দিতে গিয়ে তিনি নিজের নাম ও পদবী স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর-সংগ্রহকারীটি তাঁকে তাঁর স্বামী গর্বাটভ-এর পদবী লিখতে বলায় তিনি বলেন, "বোরিস গর্বাটভ বোরিস গর্বাটভ। আমি আমি। আমার পরিচয় আমার স্বামীর পদবী দিয়ে নয়। আমার পরিচয় আমি নিজে।" সোভিয়েটের মেয়েরা আজ কোন্‌ নতুন স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে উপরোক্ত দুটি ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ মেলে।

জার্মানীতে যখন ফ্যাশিস্টরা মেয়েদের লক্ষ্য করে 'রসুইঘরে ফিরে যাও' বলে আন্দোলন চালিয়েছে, সোভিয়েট দেশ তখন তাদের রান্নাঘরের

সংকীর্ণ পরিমিতি থেকে মুক্তি দিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীতে যাবার ছাড়পত্র দিয়েছে। ফ্যাশিস্টরা যখন বলেছে যে সন্তানসৃষ্টিই হল মেয়েদের একমাত্র কাজ; সোভিয়েট সমাজ তখন তাদের ডেকেছে সমাজগঠনের কাজে, ডেকেছে ভবিষ্যৎ ইমারতের ভিত পত্তনের কাজে।

বিপ্লবের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বহন করে এনেছে নারীমুক্তির ধ্বজা। ওখানকার মেয়েরা আজ জানে যে—মেয়েদের মা হওয়ার যে জন্মগত অধিকার তা তারা আজ ভোগ করতে পারবে...। স্বামীর সাহচর্যের ও সন্তানের অধিকারিণী হতে পারবে, তার জন্যে তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত হতে হবে না; ফলে উন্নত হবে সমস্ত জাতি।

প্রত্যেকটি সোভিয়েট মেয়ে জানে যেঃ

(ক) সে বিয়ে করুক বা না করুক জীবিকার জন্যে তাকে চিন্তা করতে হবে না, রাষ্ট্রই তার খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিয়েছে।

(খ) সন্তানের জন্ম হলে রাষ্ট্র বহন করবে প্রসূতি-সদনের সমস্ত খরচ; অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার জন্যে এক পয়সাও লাগবে না, ডাক্তার বাড়ীতে এসে দেখে যাবে তাকে।

(গ) সন্তান জন্মের আগে দু মাস এবং পরে দু মাস (অল্প-পরিশ্রমী মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩৫ দিন আগে ও ২২ দিন পরে) ছুটি তার বরাদ্দ আছে, এই কয় মাস পুরো মাইনে পাবে সে।

(ঘ) সন্তানপালনের জন্যে চিন্তা করতে হবে না তাকে, সন্তানের খরচ বাবদ রাষ্ট্র তাকে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য দেবে প্রতি মাসে।

(ঙ) দেশের কল্যাণে সামাজিক কাজ করার মত সন্তানের জন্ম দেওয়াও তাদের জীবনে এক মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

সোভিয়েট দেশের মেয়ে-শ্রমিকরা বা কৃষক-মেয়েরা কাজে যাবার সময়ে তাদের ছেলেমেয়েদের আমাদের দেশের মত অনাদৃত অবস্থায় ফেলে রেখে যায় না। যে সব ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তারা নিয়মিতভাবে স্কুলে যায় নইলে 'রেড কর্ণারে' (শ্রমিকরা যে সব ফ্ল্যাট-বাড়ীতে থাকে, সেই সমস্ত বাড়ীতে একটা করে 'রেড কর্ণার' অর্থাৎ ছোটদের ক্লাবের ব্যবস্থা আছে) খেলা করে, পড়াশোনা করে বা গল্প করে। যে সব

ছেলেমেয়েরা কোলের শিশু, মায়েরা তাদের কাজে যাবার সময় কারখানার কাছাকাছি শিশু-সদনে জমা দিয়ে যায়। যত্ন নেবার জন্যে ধাত্রীরা সেখানে সারাক্ষণ থাকে। তারা শিশুদের গায়ে লেবেল এঁটে ছোট ছোট বিছানায় শুইয়ে রাখে, খাওয়ায় দাওয়ায়, খেলা করায়; যাদের কিছুটা বুদ্ধি হয়েছে তাদের লেখাপড়া শেখায়। টিফিনের সময় মায়েরা এসে শিশু সন্তানদের দুধ খাওয়াতে পারে, তদারক করতে পারে, আদর করতে পারে। আবার ফেরার পথে বাড়ী নিয়ে যেতে পারে তাদের। কেউ ইচ্ছা করলে বেশী দিনের জন্যেও শিশুদের নিশ্চিন্তে সদনের দায়িত্বে রেখে যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মেয়েই কাজ থেকে ফেরার পথে ছেলেমেয়েদের বাড়ী নিয়ে যায়।

সারা সোভিয়েট দেশে ত্রিশ হাজারের ওপর সাধারণ ভোজনাগার আছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মব্যস্ত মানুষের জন্যে আহার তৈরী হয়। মেয়েরাও দলে দলে সেখানে গিয়ে আহার করে। রান্নাঘরের হাজার রকম ঝামেলা থেকে ছাড়া পেয়ে তারা সেই সময়টা অন্যান্য মূল্যবান কাজকর্মে ব্যয় করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সোভিয়েটের মেয়েরা রান্না করা ছেড়ে দিয়েছে বা সোভিয়েট পরিবারের অভিধান থেকে 'রান্নাঘর' শব্দটা মুছে গিয়েছে চিরদিনের জন্যে।

লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট পরিবার বাড়ীতে রান্না করে এবং যারা নিয়মিতভাবে বাইরে খায় তারাও ছুটির দিনে বা বিশেষ পরবের দিনে বাড়ীতে রান্নার উৎসব করে। রান্নার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না সোভিয়েটের মেয়েরা। কিন্তু তাই বলে তাদের জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় তারা রসুইঘরের পেছনে নষ্ট করতেও চায় না।

সাধারণতঃ সোভিয়েট শ্রমশিল্পে কাজের সময় হল সাত ঘণ্টা। যে সব কারখানার কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য সেখানে মেয়ে পুরুষ কাউকেই ছয় ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করতে দেওয়া হয় না। বাকী সময়টা তারা স্বাধীন। পড়াশোনা, বেড়ানো, সামাজিক কাজকর্ম, যা ইচ্ছে করতে পারে তারা। কেউ আপত্তি করবে না তাতে, অন্নচিন্তায় চুল পাকাতে হবে না কাউকে, পয়সার অভাবে দুধ না পেয়ে মারা যাবে না কারো শিশু সন্তান, পরিশ্রান্ত

হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হবে না কাউকে বস্তির পাঁকের মধ্যে। এ নিশ্চিতি আজ ওদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এবার দেখা যাক রাষ্ট্রের তরফ থেকে সোভিয়েটের মেয়েরা কি কি সুবিধা পেয়ে থাকে। আগেই জানিয়েছি যে সোভিয়েট সরকার দেশের প্রতিটি লোকের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তার জন্যে জনসাধারণকে কোন খরচ বহন করতে হয় না। অসুস্থ বোধ করলেই ডাক্তারখানা বা হাস-পাতালে গিয়ে পরীক্ষা করালেই হল। শয্যাশায়ী হলে ক্লিনিকে যাবার প্রয়োজন করে না, খবর পাঠালেই ডাক্তার এবং নার্স তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রমিক সংঘ সঙ্গে সঙ্গে ছুটির ব্যবস্থা করে এবং অর্থ সাহায্য দেয়। যারা শ্রমিক সংঘের সভ্য এবং এক জায়গায় স্থির হয়ে ছয় বছর কাজ করেছে তারা পুরো বেতন পায়। কিন্তু যারা তা নয় তাদের সাধারণতঃ দেওয়া হয় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সাহায্য। কেউ যদি কোন রোগে বা দুর্ঘটনায় অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, শ্রমিক সংঘ তাকে নিয়মিতভাবে তার আয়ের ৪৫ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত অর্থসাহায্য দেয়। অর্থাৎ ওদেশের প্রত্যেকটি মানুষ জানে বিপদে পড়লে তাকে না খেয়ে মরতে হবে না, রাষ্ট্র তার অন্নের সংস্থান করবে।

বৃদ্ধ বয়সে মেয়ে পুরুষ প্রত্যেক শ্রমিকেরই পেন্সনের ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ বিশ বছর কাজ করার পর বীমাব্যবস্থা চালু হয় অর্থাৎ সে তার আসল মাইনের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ পেন্সন পেয়ে থাকে। পুরুষেরা ষাট বছর এবং মেয়েরা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলেই পেন্সন দাবী করতে পারে।

সোভিয়েট দেশে সবাই পাঁচ দিন কাজ করে এবং এক দিন ছুটি ভোগ করে (ওদের দেশে ছয় দিনে সপ্তাহ) এবং প্রত্যেক বছরে দু থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত বেতনসহ ছুটি পেয়ে থাকে। এই ছুটির সময়টা সবাই স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রাম-গৃহে কাটায়। যাতায়াতের ভাড়া ও সেখানে থাকার সমস্ত খরচ শ্রমিক সংঘই দেয়। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ও ককেশাস অঞ্চলে হাজার হাজার স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রাম-গৃহ গড়ে উঠেছে সোভিয়েট সরকারের চেষ্টায়। বিপ্লবের আগে রাজা মহা-

রাজাদের বড় বড় প্রাসাদ ছিল এই সব অঞ্চলে, বিপ্লবের পর সেই সব প্রাসাদগুলিকে চাষী-মজুরদের স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত করা হয়েছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট নাগরিক এই সব জায়গায় বেড়াতে আসে এবং ছুটি উপভোগ করে।

এ তো গেল বাৎসরিক ছুটির কথা। কিন্তু রবিবারের ছুটি কাটানোর জন্যেও সোভিয়েট দেশে একদিনের বিশ্রামাবাস (One Day Rest Home) রয়েছে। প্রতি রবিবার লোকদের ভীড়ে সরগরম হয়ে ওঠে এই বিশ্রামাবাসগুলি। সবাই ছুটিতে উৎসব করতে আসে। আলাদা আলাদা ভাবে নয়, সবাই একসঙ্গে সেদিনের উল্লাসকে ভাগ করে নেয় খেলাধুলো, ভ্রমণ, গল্প-গুজব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। সেদিন বিশ্রামাবাস থেকে চারবার আহার পরিবেশন করা হয় সবাইকে। খাওয়ার পর যারা যেখানে খুশি দলবেঁধে বেড়াতে যেতে পারে, নৌকাভ্রমণে বেরোতে পারে, টেনিস, ভলিবল, টেবল ক্রীড়া যা ইচ্ছে খেলতে পারে, গল্প গুজব করে সময় কাটাতে পারে। তাদের অবসর তারা কী ভাবে যাপন করবে তা নির্ভর করে সময়ের মালিকের ওপর।

১৯৩৮ সালে একটা হিসাব থেকে জানা যায় যে সোভিয়েট শ্রমিক সংঘ সে বছরে তার ছয় লক্ষ সভ্যকে এই রকম 'একদিনের বিশ্রামাবাসে' পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে।

এখানে জেনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রামাবাসেই সারাক্ষণের ডাক্তার এবং নার্সের ব্যবস্থা আছে। নিয়মিতভাবে তারা প্রত্যেক ভ্রমণকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখে এবং সামান্য অসুস্থ হলেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এর জন্যে কাউকে এক পয়সা ফী দিতে হয় না।

সোভিয়েট দেশের মানুষ এক নিশ্চিতি পেয়েছে। মানুষকে বড় করার জন্যে, জীবনকে প্রসারিত করার জন্যে এবং মনকে সমৃদ্ধ করার জন্যে যে মালমশলা প্রয়োজন সে মালমশলা অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার নিশ্চিতি। কোন রকম দৈন্য কলুষিত করবে না তাদের নিষ্কলুষ জীবনকে—এই নিশ্চিতিই এক-ষষ্ঠাংশ দেশের মানুষের চোখে এক বৃহত্তম সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

এই অধ্যায়ে সোভিয়েট দেশের পারিবারিক জীবনের বিস্তার ও গুরুত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সোভিয়েট সমাজের জন্মের পর থেকে 'পরিবারের' প্রশ্নকে বৃহত্তর সমস্যা হিসাবে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন রাষ্ট্রনায়করা। কারণ পারিবারিক সম্বন্ধের ওপরই সমাজের গঠনবিন্যাস অনেকটা নির্ভরশীল। সে কারণে বিপ্লবের কিছুদিন পরে ১৯১৮ সালের শরৎকালে কর্তৃপক্ষ 'জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু' এবং 'বিবাহ, পরিবার ও অভিভাবকত্ব' সম্বন্ধে বিস্তারিত আইনকানুন প্রণয়ন করেছে। তার পরও বহু ছোটখাটো বিধান কার্যকরী হয়েছে বিশেষ করে ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালে। এবং এই বিধান অনুযায়ীই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই বিধানগুলি গৃহীত হবার আগে সোভিয়েট সরকার সেগুলি সারা দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেছিল এবং জনসাধারণের মতামত ও সংশোধনগুলি আলোচিত হওয়ার পর সেগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল।

বিবাহ সম্বন্ধে সোভিয়েটের বিধান কি?

সোভিয়েট-ব্যবস্থা একমাত্র লৌকিক বিবাহ (civil marriage) স্বীকার করে। কিন্তু তাই বলে গির্জার আচার ও অনুষ্ঠান মাফিক বিবাহে কর্তৃপক্ষ কোন বাধা দেয় না। সোভিয়েট গঠনতন্ত্রেই প্রত্যেকটি মানুষের ধর্ম সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। ধর্ম এবং রাষ্ট্র পরস্পর থেকে আলাদা। সুতরাং একমাত্র লৌকিক বিবাহই সোভিয়েট সমাজের মতে আইনসংগত বিবাহ। একথা অবিশ্যি বিপ্লব-পূর্ব যুগের বিবাহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। বিপ্লবের পর সেগুলিকে আইনসংগত বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েট দেশে কোন যুবক যুবতী বিয়ে করতে চাইলে তাদের এই জানিয়ে একটা আবেদন করতে হয় রেজিস্ট্রারের আপিসে যে তাদের দুজনেরই স্বাস্থ্য রাষ্ট্র কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছে। তাদের আরও জানাতে হয় যে এই বিবাহ তাদের প্রথম দ্বিতীয় কি তৃতীয় বিবাহ ও তাদের পূর্বেকার বন্ধন-জাত কোন ছেলে মেয়ে আছে কিনা। তারপর রেজিস্ট্রার যুবক-যুবতীর কাছে বিয়ের আইনকানুনগুলি পড়ে শোনায় এবং ভুল খবর দেওয়ার পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়। অতঃপর

আইনের কোন রকম বাধা না থাকলে দুজনের স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করার পর বিয়ের কাজ শেষ হয়। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রারই হল দায়িত্বশীল সাক্ষী। বিয়ের পর তাদের দুজনের 'ছাড়পত্রে'* এই বিয়ের কথা স্বাভাবিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। যদি দেখা যায় যে কোন আইনগত অসুবিধা আছে তাহলে বিয়ে স্থগিত রেখে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলে।

সোভিয়েট আইন অনুসারে দু-পক্ষের অনুমোদন থাকলেই বিয়ে রেজেস্ট্রীকৃত হতে পারে। তৃতীয় পক্ষ যেমন বাপ-মা বা অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ সেখানে অপ্রয়োজনীয়। সোভিয়েট আইন এমন কি অভিভাবকদের পরোক্ষ সম্মতির অপেক্ষাও রাখে না। অভিভাবকদের অনুমোদন না থাকলে তাদের ছেলে বা মেয়ে সম্পত্তিচ্যুত হবে, এ প্রশ্ন ওদেশে ওঠে না। তাই প্রত্যেক নাগরিক যারই বিয়ের বয়স (আঠারো বছর) হয়েছে সে-ই নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছাই করে নিতে পারে।

পাঠকদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আচ্ছা, সোভিয়েটে ছেলেমেয়েরা কি তাহলে বাপ-মা বা অভিভাবকদের না জানিয়েই বিয়ে করে? তারা কি সত্যিই এতই উচ্ছৃঙ্খল এবং বাপ-মাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন? পাঠকদের মনে এ প্রশ্ন জাগা হয়তো অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সোভিয়েট সমাজকে আমাদের এক নতুন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। কারণ ওপরে যে বিবাহ আইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তি রচিত হয়েছে 'সমস্ত রকম শোষণমুক্ত বিধানের' জমিনের ওপর। আমাদের দেশে বা অন্যান্য দেশে বাপ-মা বা অভিভাবকদের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে কত তরুণ জীবন বিনষ্ট হয়েছে সেই কলঙ্কময় ছবি আমাদের চোখের সামনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সোভিয়েটের সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে

* সোভিয়েট দেশে নারী পুরুষ প্রত্যেক নাগরিকের একটি করে ছাড়পত্র আছে। এই ছাড়পত্রই তার নাগরিকত্ব প্রমাণ করে।

সঙ্গে এই সর্বাঙ্গীন মুক্তির ভিত পত্তন করেছে। আসলে সোভিয়েটের ছেলেমেয়েরা বিয়ে করার আগে নিশ্চয়ই অভিভাবকদের জানিয়ে বিয়ে করে কারণ অভিভাবকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও স্বাভাবিক। কিন্তু আইন লিপিবদ্ধ রইলঃ যদি অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা চলে সে ক্ষেত্রে এই আইন যুবক-যুবতীদের সাহায্য করবে।

কোন যুবক যুবতী যদি লৌকিক বিবাহ না করে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে চায়, সোভিয়েট আইন তাতে কোন বাধা দেয় না। সোভিয়েট নাগরিকের এ স্বাধীনতা আছে। এবং তাদের সন্তান হলে তা অবৈধ বলে অবজ্ঞাত হয় না। রাষ্ট্রের চোখে কোন শিশুই অবৈধ নয়। প্রত্যেক শিশুই রাষ্ট্রের কাছে সমান দৃষ্টি পাবার দাবী রাখে। কিন্তু ওদেশে এ রকমের জিনিস ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। আজকাল সাধারণতঃ সবাই রেজিস্ট্রারের আপিসে গিয়েই তাদের বিয়ে তালিকা-ভুক্ত করায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের বেলাও তারা তেমনি রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন পেশ করে এবং জনসাধারণের আদালতে বিচার হওয়ার পর তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয়। সম্ভব হলে আদালত দুজনের মধ্যে মীমাংসা করার চেষ্টা করে। ১৯৪৪ সালের নতুন ডিক্রী অনুযায়ী বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া না দেওয়া আদালতের ওপর নির্ভর করে। কেউ হঠাৎ খেয়ালের বশে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলেই তা ঘটাতে পারে না। কিন্তু তাই বলে বিপ্লব-পূর্ব যুগের মত নয়, প্রয়োজন থাকলে এবং সমীচীন হলে, বিবাহ-বিচ্ছেদে কোন অজুহাতেই বাধা দেওয়া হয় না।

বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে ছেলে-মেয়েরা (যদি ইতিমধ্যে কোন সন্তান জন্ম-লাভ করে থাকে) মা বা বাপ কার কাছে থাকবে এবং কে তার ভরণ-পোষণের খরচ বহন করবে তা আদালতে স্থিরীকৃত হয়।

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে সোভিয়েট দেশে মেয়েদের জাতীয়-করণ (nationalisation) হয়েছে অর্থাৎ সোভিয়েট সমাজের নৈতিক জীবন এত দূষিত যে সেখানে সতীত্ব, মাতৃত্ব ও সভ্যতা বলে কোন জিনিস নেই। এই মিথ্যা অপপ্রচারের মূল হল ধনবাদী দেশগুলি।

সেই দেশগুলির গণ্ডি ছাপিয়ে আমাদের দেশে এসে পেঁচিছে এই মিথ্যা প্রচারের স্রোত। আসল কথা সোভিয়েট বিপ্লব মানুষে-মানুষে এবং নারী-পুরুষে যে অবাধ স্বাধীনতার পত্তন করেছে, সেই স্বাধীনতা সম্পর্কে পুঁজিবাদীদের প্রধান আপত্তি! এবং সে জন্যেই তাদের মুখে সতীত্ব ও মাতৃত্বের জিগির!

আজ আমাদের সমাজের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? দেখতে পাই স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নানা সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক অসাম্য ও অসামঞ্জস্য, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার অভাব, তাদের মধ্যে নরনারীর সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অমার্জনীয় অজ্ঞতা সমস্ত সমাজকে কলঙ্কিত করে তুলেছে। একটি ছেলে একটি মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না। যদি কখনও লোকচক্ষুর বাইরে তাদের দুজনকে কথা বলতে দেখি, তাহলে দেখি অত্যন্ত কৃত্রিম ভঙ্গীতে তারা কথা বলছে। দুজনেই দুজনের সম্বন্ধে এমন এক অবাস্তব ধারণা পোষণ করছে যা স্বাভাবিকও নয়, বাস্তবও নয়। কিন্তু একদিন বাস্তব জগতের মুখোমুখী তাদের দুজন-কেই দাঁড়াতে হয়। সেদিন তাদের সামনে তিনটি পথ খোলা: প্রথম, অত্যন্ত ভালো ছেলের মতন সহস্র অসঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক বিধানকে মেনে নেওয়া; দ্বিতীয়, সামাজিক বিধানকে মন দিয়ে গ্রহণ করতে না পেরে হতা-শার আশ্রয় খোঁজা। তৃতীয়, বিদ্রোহ করা। মানুষে মানুষে এবং নারী পুরুষে স্বাভাবিক মেলামেশার অভাব অনেক রকম সামাজিক দুর্নীতি, ব্যাভিচার ও হতাশার জন্যে দায়ী। এই অসঙ্গতিকে সোভিয়েট-বিপ্লবের সম্মার্জনী পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিয়েছে। আজ তাদের মধ্যে তাই দুর্নীতি নেই, নেই অসামঞ্জস্য।

সোভিয়েট সমাজ মেয়েদের ওপর সমস্ত রকম শোষণ বে-আইনী ঘোষণা করেছে। জারের আমলের কথাই ধরা যাক না। সেদিন গণিকারা পথে ঘাটে, শহরের গলিঘুঁজিতে সমস্ত জনসমাজের স্বাস্থ্যকে দূষিত করে তুলেছিল। কিন্তু আজ? সোভিয়েট ব্যবস্থার পত্তনের পর থেকে গণিকালয়ের দরজাগুলো চিরদিনের জন্যে বন্ধ। আজ আর মেয়েদের কেউ পণ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারে না। রাষ্ট্র আইন

করে গণিকাবৃত্তিকে বেআইনী ঘোষণা করেছে। যারা ত্রিশ বছর আগে এই বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা আহরণ করত, তারা আজ সমাজে সংস্কৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিপ্লবের আগে মায়েদের কী অশেষ দুর্ভোগ হত তার কথা আগেই বলেছি। সন্তানের জন্ম দিয়ে তার খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার স্বাভাবিক ব্যবস্থা করে উঠতে পারত না তারা। ফলে বহু শিশুই অকালে মারা যেত। এমনকি প্রসবের সময়েই গড়ে ত্রিশ হাজার মাকে মৃত্যু বরণ করতে হত। প্রতি বছর বিশ লক্ষ শিশুর জীবনে নেমে আসত অকাল মৃত্যুর প্রেতচ্ছায়া। প্রতি বছর বিশ লক্ষ মা-র চোখের জলে কাদা হয়ে উঠত রাশিয়ার মাটি। প্রতি বছর চল্লিশ লক্ষ কড়া-পড়া হাত গোর দিত নির্মম সমাজ-ব্যবস্থার বিশ লক্ষ শিকারকে। কিন্তু ১৯১৮ সালে এক জরুরী ডিক্রি জারি করে শিশু-রক্ষার বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সোভিয়েট সরকার।

সাম্যবাদী রাষ্ট্র মাতৃত্বকে আজ যে মর্যাদা দিয়েছে তার শতাংশের একাংশও অন্য কোন দেশ দেয়নি। সন্তানের জন্মের পর তার লালন-পালনের জন্যে রাষ্ট্র নিয়মিতভাবে মায়েদের কি ভাবে অর্থসাহায্য করে, নীচের হিসাব থেকে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবেঃ—

	একালীন দান (রুবল)	মাসিক দান (রুবল)
তৃতীয় সন্তান জন্মের পর	৪০০	—
চতুর্থ ” ” ”	১,৩০০	৪০
পঞ্চম ” ” ”	১,৭০০	১২০
ষষ্ঠ ” ” ”	২,০০০	১৪০
সপ্তম ” ” ”	২,৫০০	২০০
অষ্টম ” ” ”	২,৫০০	২০০
নবম ” ” ”	৩,৫০০	২৫০
দশম ” ” ”	৩,৫০০	২৫০
দশম সন্তানের জন্মের পর প্রত্যেকটি সন্তানের বেলায়	৫,০০০	৩০০

যে সব তরুণ তরুণীর বিবাহ রেজিস্ট্রারের আপিসে তালিকাভুক্ত হয়নি তারা রাষ্ট্র থেকে সন্তানের ১২ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে ঃ—

প্রথম সন্তান	১০০ রুবল
দ্বিতীয় ,,	১৫০ ,,
তৃতীয় ,,	২০০ ,,

যদি কোন অবিবাহিতা মা তার সন্তানকে লালন-পালন করতে ইচ্ছুক না হয় বা কোন রকম অসুবিধা বোধ করে তাহলে শিশু-সদন তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করে সোভিয়েট সরকার। অর্থাৎ বাপ বা মাকে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না। কিন্তু সন্তানের ওপর মার দাবী চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, যে কোন দিন মা ইচ্ছে করলেই তার সন্তানকে ফিরে পেতে পারে।

অর্থসাহায্য ছাড়াও মায়েরা 'মাতৃত্ব পদক' পেয়ে থাকে যেমন "অর্ডার অব দি গ্লোরিয়াস মাদারহুড", "হিরোয়িন মাদার", "অর্ডার অব্ দি হিরোয়িন মাদার" ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পদক অবিশ্যি সন্তানের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল।

এবারে সোভিয়েট সমাজ মায়েদের আরো কী কী সুবিধা দিয়েছে দেখা যাক। ১৯১৩ সালে প্রসূতি-সদনে বেড-এর সংখ্যা ছিল মাত্র সাত হাজার। ১৯৪১ সালে তা বেড়েছে উনিশগুণ—অর্থাৎ এক লক্ষ চল্লিশ হাজারেরও বেশী (শহরে ৭৬,০০০; গ্রামে ৬৪,০০০)। কিন্তু প্রসূতি-সদনে যাবার আগে মায়েদের অনেক কিছু জানার দরকার পড়ে। সে কারণে সারা সোভিয়েট দেশে প্রায় ৫,০০০ পরামর্শ-কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির কাজ হল মায়েদের বিনামূল্যে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়ে সাহায্য করা। কিন্তু সোভিয়েটের প্রসূতি-সদনগুলি কী রকম? আমাদের ভারতবর্ষের মত, না তার চেয়ে কিছুটা উন্নত। আমাদের দেশের কথা দূরে থাক, কোন দেশই এ ব্যাপারে সোভিয়েটের কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে না। সদনগুলি বাড়ীর তুলনায় যেন একেকটি স্বর্গ। হাজার রকম সুখ সুবিধা যা আমরা কল্পনা করতেও সাহস করি না।

পৃথিবীতে এমন কোন্ জায়গা আছে যেখানকার মাতৃ-সদনে হাজার হাজার প্রসূতিকে বিনামূল্যে স্থান দেওয়া হয়? এমন কোন্ মাতৃ-সদন আছে যেখানে প্রসূতিরা সারাক্ষণ 'ইয়ার-ফোন' (এই যন্ত্রটি দু-কানে লাগালে বেতারের সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান শোনা যায় অথচ তার শব্দ বাইরে ধ্বনিত হয়ে কারো বিরক্তি উৎপাদন করে না)-এর সাহায্যে পৃথিবীর সংগীত শুনতে পারে? এমন কোন্ দেশ আছে, যে দেশ সোভিয়েটের মত গর্ব করে বলতে পারে যে তার মাতৃ-সদনে প্রসূতিরা বিছানার ধারের টেলিফোনের সাহায্যে যতক্ষণ ইচ্ছে তার স্বামী, পুত্র বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে পারে? এবং সমস্ত কিছু বিনামূল্যে?

ভারতবর্ষের মেয়েরা একবার কল্পনা করুন যে সাধারণ চাষীর মেয়ে, সাধারণ মজুরের মেয়ে সোভিয়েট দেশে আজ কোন্ স্তরে উন্নীত হয়েছে! কেন আজ সোভিয়েট দেশ তার দেশবাসীকে, তার মেয়েদের এমনি অবারিত সুখ, সুবিধা, ঐশ্বর্য দিচ্ছে যা অন্যান্য দেশ দিতে কুণ্ঠিত। দিচ্ছে তার কারণ সোভিয়েট দেশ কোন কায়েমী স্বার্থ-সম্পন্ন দল বা চক্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। জনসাধারণই আজ সে দেশের মালিক।

প্রসব-কালীন অবসর, মাতৃ-সদন ও অর্থসাহায্য ছাড়াও প্রসূতিরা আরো দুটি সুবিধা পেয়ে থাকে যেমন গর্ভাবস্থার চতুর্থ মাস থেকে তাদের পরিশ্রমবহুল কাজ বা অতিরিক্ত কাজ (overtime) দেওয়া হয় না। এবং তখন থেকেই তারা ডবল রেশন পেয়ে থাকে।

পারিবারিক ভিত্তি আরো বেশী দৃঢ় করার জন্যে সোভিয়েট দেশে কতকগুলি কর ধার্য করা হয়েছে। যারা অবিবাহিত, সন্তানহীন বা এক বা দুই সন্তানের বাপ-মা তারা পড়ে এই আইনের গণ্ডিতে। পুরুষদের ২০ থেকে ৫০ বছর এবং মেয়েদের ২০ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই কর নিয়মিতভাবে দিতে হয়।

(ক) অবিবাহিত বা সন্তানহীন স্ত্রী-পুরুষ যারা আয়-কর দেয় তাদের আয়ের শতকরা ছয় ভাগ অর্থ কর হিসাবে দিতে হয়। যাদের একটি সন্তান তারা দেয় শতকরা এক ভাগ এবং যারা দুই সন্তানের বাপ-মা তারা দেয় শতকরা এক ভাগের আধ ভাগ।

(খ) যৌথ চাষী, স্বতন্ত্র চাষী বা খামারের অন্যান্য কর্মী যারা কৃষিকর দেয় তাদের যথাক্রমে ১৫০ রুবল, ৫০ রুবল ও ২৫ রুবল দিতে হয়।

(গ) অন্যান্য নাগরিক যারা আয়-কর বা কৃষি-কর দেয় না তারা যথাক্রমে ৯০ রুবল, ৩০ রুবল ও পনের রুবল কর দিয়ে থাকে।

এই করের অর্থ কি? এই কর ধার্যের অর্থ মিলবে সোভিয়েটের নীতির মধ্যে। প্রত্যেকটি নাগরিক অত্যন্ত সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে তার জীবনকে গড়ে তুলুক—সোভিয়েটের এই নীতিই তার প্রত্যেকটি কার্যপদ্ধতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং এই কর সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে সংসার জীবন যাপন করতে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও মধুর ও আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে উৎসাহিত করে।

আমাদের দেশের কথা আলাদা। এখানে আমরা স্বাভাবিকভাবে, সুস্থ-ভাবে জীবনকে গড়ে তোলার কথা চিন্তাই করতে পারি না। দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জীবনকে ভেঙে চুরে দুমড়ে, ছোট করে তবে আমাদের বাঁচতে হয়। সোভিয়েট দেশ পেরেছে। কারণ একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর তারা দাঁড় করিয়েছে তাদের সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে।

সোভিয়েট ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের ওপর নিয়েছে কারণ ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাপ-মার দায়িত্বের চেয়েও রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেক বেশী কারণ আগামী দিনের নাগরিককে অবহেলার চোখে দেখলে চলবে না। তাই যখন ওদেশের শিক্ষা-জগতের দিকে তাকাই তখন অবাক লাগে...অবাক লাগে ওদের বিস্ফার দেখে। এই বিস্ফার, এই ব্যাপ্তি ওরা পেল কোথায়? কোন্ যাদুর গুণে ওরা এই সম্পদের অধিকারী হল?

১৯১৭ সালের রুশ সমাজের দিকে তাকান। অশিক্ষার অন্ধকারে তলিয়ে আছে সমস্ত দেশ। শিক্ষা হল ধনিকদের একচেটে। দেশের হাজার হাজার দরিদ্র জনসাধারণ তা থেকে বঞ্চিত। আজ সে অবস্থা পালটেছে আগাগোড়া।

১৯১৩ সালে সমস্ত রুশ সাম্রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলযাত্রী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ৭৮ লক্ষ অর্থাৎ জমিদার, বড়লোক ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই তখন যেত স্কুলে পড়তে। ১৯৪০ সালে স্কুলযাত্রী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা হল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ।

১৯১৪ সালে শিশু-সদনে মোট বেড-এর সংখ্যা ছিল ৫৫০। ভেবে দেখা যাক ১৯৩৮ সালে সে সংখ্যা কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাবতে গেলে কল্পনাশক্তিকে অনেক দূর প্রসারিত করতে হবে। কারণ তার সংখ্যা অবিশ্বাস্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫৫০ থেকে একেবারে ৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৫১-য়। ১৯৩৬ সালে কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা হল ৫৫,১০২ যা ১৯১৯ সালে ছিল মাত্র ২৭৫টি।

ছেলেমেয়েদের কী করে শিক্ষা দেবে, কী করে স্কুলের ফী আর বইয়ের খরচ যোগাবে, এ চিন্তা ওদেশের কোন বাপ মাকে করতে হয় না। কারণ শিক্ষার দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছে। এবং আইন করে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে।

ছেলেমেয়েরা তিন বছর বয়স থেকেই কমিসেরিয়েট অব হেল্‌থের তত্ত্বাবধানে থাকে অর্থাৎ শিশু-সদন তার কল্যাণের জন্য সমস্ত দিকে দৃষ্টি দেয়। এবং এই শিশু-সদনে শিক্ষার ভার গ্রহণ করে কমিসেরিয়েট অব এডুকেশন। সাত বছর পর্যন্ত তারই তত্ত্বাবধানে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা অগ্রসর হতে থাকে।

আগেই জানিয়েছি কাজে যাবার পথে মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের শিশু-সদনে জমা রেখে যায়। অর্থাৎ সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যে ৫টা কিংবা সকাল ৯টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা (যারা স্থায়ীভাবে শিশু-সদনেই থাকে তাদের কথা স্বতন্ত্র) এইখানে থাকে। এই নয়-দশ ঘণ্টা সময় তারা যে ভাবে কাটায় তা অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। সাধারণ খেলা, শিক্ষামূলক খেলা, বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুম—এই হল মোটামুটি তাদের প্রোগ্রাম। শিক্ষামূলক খেলার মধ্যে দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

আট বছর বয়স থেকে আরম্ভ হয় বাধ্যতামূলক শিক্ষা। এবং পনের বছর বয়স পর্যন্ত তা চালু থাকে। পনের বছর বয়স থেকে উচ্চ শিক্ষার

আয়োজন। এই উচ্চ শিক্ষা অবিশ্যি বাধ্যতামূলক নয়। যার যে বিষয়ে আগ্রহ ও যার যে পরিমাণ আগ্রহ তারা সে ভাবে শিক্ষা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে।

এ তো গেল শিক্ষার কথা। এ দিক থেকে সোভিয়েট দেশের প্রত্যেকটি বাপ-মা আজ নিশ্চিন্ত। তারা জানে রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের তারা অনেক বড় অনেক যোগ্য হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

শিক্ষা-জগতে মেয়েরা কত দায়িত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তা আগে আলোচনা করেছি। যারা সোভিয়েট দেশের শিক্ষা পরিচালনা করে মেয়েরা হল তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ।

ক্রীড়া জগতেও মেয়েদের মধ্যে এক অপূর্ব উন্মাদনা চোখে পড়ে। প্যারাসুট থেকে লাফানো, নৌকা-দৌড়, ফুটবল, ভলিবল, টেনিস, স্কিয়ীং, স্কেটিং, বক্সিং, জল পোলো, ভার উত্তোলন, সাঁতার কাটা, বন্দুক ছোড়া ...কী নয়? খেলাধুলোর মধ্যে ডুবে আছে ওখানকার মেয়েরা। শুধু তাই নয়, তারা কয়েকটা বিষয়ে সারা পৃথিবীর রেকর্ডকে পর্যন্ত ভাঙতে পেরেছে। যেমন মস্কোর মেয়ে বুইকোভা—১৯৩৫ সালে সে ৩০০ মিটার রেসে আগেকার প্রতিদ্বন্দ্বীকে (যিনি ৪৮·৬ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন) হারিয়ে দিয়ে মাত্র ৪১·৬ সেকেন্ডে দৌড়তে সক্ষম হয়। সেই বছরেই লেনিনগ্রাদের মেয়ে মাস্লোভা ৫৭·০৫ মিটারের রেকর্ড ভঙ্গ করে ৬২·২০ মিটার দূরে বর্শা ফেলতে সফল হয়। ১৯৩৬ সালে গোর্কী শহরের মেয়ে কুজ্নেটসোভা ৫,০০০ মিটার দূরত্ব ১০ মিনিট ২১·২ সেকেন্ডে স্কেট করতে পারে। তার আগের প্রতিদ্বন্দ্বী পেরেছিল ১০ মিনিট ৩৩·৬ সেকেন্ডে। সোভিয়েট ক্রীড়া জগতের বত্রিশ বছর আগেকার ইতিহাসের পানে যদি তাকাই তাহলে পাব যে সে সময়ে মেয়েদের কথা দূরে থাক সাধারণ পুরুষরাই তাতে যোগদান করার কথা চিন্তা করতে পারত না। তখন খেলাধুলো ছিল বড়লোক-দের একচেটে।

১৯৩৫ সালে মেয়ে-পুরুষ উভয়েই খেলাধুলোর ব্যাপারে কী পরিমাণ আগ্রহ নিচ্ছে নীচের তথ্য থেকে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

শতকরা হিসাব

	কুস্তিবিদ্যা	মাঠের খেলা	সাঁতার
পুরুষ	১৫·৭	২৩·৯	৩·৭
নারী	২৭·৭	৩৪·৩	৫·৩
	ভলিবল	দাবাবোড়ে	অন্যান্য ক্রীড়া
পুরুষ	১২·৫	১৬·৪	২৭·৫
নারী	১৭·৩	৬·৪	৭·০

বিশ লক্ষের ওপর মেয়ে খেলাধুলোয় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের মধ্যে হাজার হাজার মেয়ে আছে যারা সেরা সাঁতারু, দাঁড়ী, স্কীয়র ও স্কেটর হওয়ার উপযুক্ত। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেয়ে ইতিমধ্যে খেলাধুলোয় উত্তীর্ণ হয়ে "লেবার এন্ড ডিফেন্স ব্যাজ" পেয়েছে। এই সব মেয়েরা শুধু নিজের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীময় পরিচিত।

সোভিয়েট মেয়েদের জীবন পরিবর্তনের যে ধারা আমরা এই কয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র জগৎ জুড়ে যে বিপ্লব এল সেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই নতুন গতিপথ খুঁজে পেল সোভিয়েট দেশের স্ত্রীজাতি। অথচ ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই হাজার রকম শাসন আর সংস্কারের শেকল দিয়ে বাঁধা সে সব দেশের মেয়েরা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কলকারখানায় প্রবেশ করা মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক, তাদের স্বাস্থ্য ও সন্তান-ধারণের পক্ষে হানিকর। কিন্তু সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা প্রমাণ করেছে যে এ বিশ্বাস ভুল। এ হল পুঁজিবাদী শোষকদের প্রবঞ্চনা।

সোভিয়েট দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতাকে সমস্ত কিছু থেকে স্বতন্ত্র করে দেখলে চলবে না, বিশ কোটি নিপীড়িত জনসাধারণের সামগ্রিক জাতীয় মুক্তির পাশাপাশি রেখে সমস্তটা বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। কারণ যে নীতি সোভিয়েট দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে সেই নীতির পেছনে ছিল দেশের সর্বাঙ্গীন মুক্তির প্রচেষ্টা। আমাদের ভারতবর্ষের বেলায় একথা খুব স্পষ্টভাবে বুঝে দেখতে হবে। কারণ স্ত্রী-স্বাধীনতার

৫

সংগ্রাম শুধুমাত্র সামাজিক সংগ্রামই নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামও। নারী-মুক্তির সংগ্রাম আলাদাভাবে চলে না...রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই তা অগ্রসর হয়। কারণ নারীমুক্তির সংগ্রাম আসলে পুরুষ জাতির সঙ্গে নয়, সে সংগ্রাম হল সেই শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা পুরুষজাতিকে স্ত্রীজাতির শাসক ও শোষকে পরিণত করেছে। নতুন জীবনের পথ? হ্যাঁ, নতুন জীবনের পথেরই হদিশ পেয়েছে আজ সোভিয়েটের মেয়েরা, সন্ধান পেয়েছে এক নতুন জগতের যে জগৎ এক-মাত্র সাম্যবাদের সুস্থ ও সবল ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠতে পারে।

এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন বৃদ্ধাদের মনকে কি ভাবে স্পর্শ করেছে তা একটা ছোট ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে।

১৯৩৭-৩৮ সালে বিখ্যাত মার্কিন শিক্ষয়িত্রী ডিয়ানা লেভিন একবার রেল যোগে সোচি যাচ্ছিলেন। তাঁর ট্রেনের কামরায় একজন লাল-ফৌজের সৈন্য, একজন বৃদ্ধা ও আঠাশ বছর বয়স্কা একটি মহিলা ভ্রমণ করছিলেন। অনেক আলাপ আলোচনার মাঝখানে বৃদ্ধাটি ফেটে পড়লেন। তাঁকে বললেন "তোমার দেশে বিপ্লব হয়নি। হয়েছে কি? এদিকে বিপ্লব আমার দেশের কী অবস্থা করেছে দেখো। আমি যৌথ খামারে থাকি। আমার বড় ছেলে ট্রাক্টর চালায় আর আমার মেয়ে হল রাখাল দলের পরিচালিকা। আমার মেজ ছেলে মস্কোয় কৃষি-বিদ্যা পড়ছে। আমাদের খামার তাকে সেখানে পাঠিয়েছে। আমার নাতি-নাতনীরা সবাই চমৎকার শিক্ষা পাচ্ছে। আমি নিজে অবিশ্যি লিখতে পড়তে জানি না। বয়সও হয়েছে, সুতরাং আর সম্ভবও নয়। কিন্তু আমি এইটুকু জানি—করুক দেখি কেউ আমাদের দেশ আক্রমণ—আমরা তাকে উচিত শাস্তি দেব।" বৃদ্ধাটি বজ্রমুষ্টি তুললেন।

"সাবাস, সাবাস, দিদিমা। এই তো উচিত কথা" লাফিয়ে উঠে অভি-নন্দন জানালো লালফৌজের সৈন্যরা।*

একটি বৃদ্ধার মধ্যে এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন হল কী করে? এ রাষ্ট্রের তরফ থেকে শেখানো কোন প্রচারকর্ম নয়। নতুন জীবনের পাঠ থেকেই এ শিক্ষা নিয়েছেন সোভিয়েট বৃদ্ধাটি।

* অনিলকুমার সিংহ অনূদিত "সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা" থেকে উদ্ধৃত।

প্যাট স্লোন একজন ইংরাজ লেখক। তিনি বহুবার সোভিয়েট দেশে গিয়েছেন। এবং সেখানে দীর্ঘ দিন থেকে সে সমাজের সামগ্রিক রূপকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৩২ সালে তিনি যখন মস্কো যান তখন একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মেয়েটি যে বাড়ীতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সে বাড়ীতেই পরিচারিকার* কাজ করত। গ্রামের মেয়ে ...একেবারে অশিক্ষিতা। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত জোটেনি তার ভাগ্যে। ইংলণ্ডে লোকে অত্যন্ত খেলো দৃষ্টিতে দেখে থাকে এই সব মেয়েদের। ১৯৩৭ সালে আবার যখন প্যাট স্লোন মস্কোয় যান তখন সেই মেয়েটি আর সে-মেয়েটি নেই। জিজ্ঞাসু স্লোনের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল "—পরিচারিকার কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি একটা ল্যাবরেটরিতে যুক্ত আছি এবং ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছি।"†

কথা শুনে স্লোন আশ্চর্য বোধ করলেন না কারণ ইতিমধ্যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সোভিয়েট সমাজের পেছনকার জীবন-দর্শন। তিনি শুধু এইটুকু ভাবলেন যে, মেয়েটি যদি মস্কোয় না থেকে ইংলণ্ডে থাকত তাহলে কী হত তার ভবিষ্যৎ? গ্রামের সেই অশিক্ষিতা মেয়েটি শুধু এক মনিবের দরজা থেকে অন্য এক মনিবের দরজায় ঘুরে বেড়াত!

শুধু এই একটি মেয়েই নয়, এমনি হাজার হাজার মেয়ে সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে এসে সোভিয়েট দেশে উচ্চশীর্ষে বসবার সম্মান পেয়েছে। যে কোন দেশের মেয়ে তার সমাজের কাছ থেকে এমনি সম্মান ও মর্যাদা দাবী করতে পারে কিন্তু তার আগে তাকে তার সমাজের রূপ পালটাতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে হবে।

আজ সোভিয়েট মেয়েদের সামনে সুস্থ ও সুখী জীবনের এক অপরিমেয় বিস্তৃতি। মাতৃত্বের মর্যাদায় তাদের নারীত্ব আজ সমৃদ্ধ...এক নতুন সম্পদের অধিকারিণী। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ তাদের জীবনে এক অমূল্য অনুপ্রেরণা। এই নতুন জীবনের স্ফুরণকে সবচেয়ে আগে

---

* বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েট দেশে পরিচারিকা রাখার অভ্যাস ও প্রয়োজন ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৩৬ সালের হিসাব থেকে জানা যায় যে সে দেশে তখন পরিচারিকার সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র দু ভাগ।

† সুধাংশু সরকার অনূদিত "বিপ্লবোত্তর রাশিয়া" থেকে উদ্ধৃত।

স্বীকৃতি দেবে আমাদের দেশের মেয়েরা—যারা আজও পিছিয়ে পড়ে আছে।

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎকর্ষ

শ্রমজীবী হিসাবে সোভিয়েট মেয়েদের উন্নতি ও কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে তাদের সমাজগত ও সংস্কৃতিগত চেতনা—যে চেতনা ও উপলব্ধি বিপ্লবোত্তর সমাজের এক সুষ্ঠু ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। বিপ্লব সফল হবার পর থেকেই বলশেভিকরা মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করছিল এবং ১৯১৯ সাল থেকে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়েছিল নিরক্ষরতা-বিরোধী অভিযান। শহরে এবং গ্রামে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছিল এই সামাজিক ব্যাধিকে উচ্ছেদ করার জন্যে। ফলে ১৯১৯ সালেই একটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। দেখা যায় মেয়েরা দলে দলে 'সোভিয়েটের' প্রতিনিধি নির্বাচনের কাজের মধ্যে এগিয়ে আসছে যা পূর্বে কোনদিন লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু সোভিয়েটের মেয়েদের মধ্যে যে ব্যাপক পরিবর্তন এল, সে পরিবর্তন এল ১৯২৭ সালে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে।

জারের আমলে শতকরা ৭০ ভাগ লোক এক অক্ষর লিখতে পড়তে জানত না। গ্রামের কৃষক-মেয়ে ও কলকারখানার মেয়ে-শ্রমিকদের মধ্যে নিরক্ষরতা ছিল আরও প্রবল, আরও গভীর। ১৯২০ সালে মোট জনসংখ্যার ৬৭ ভাগ ছিল অশিক্ষিত। মেয়েদের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা ছিল আরও বেশী—শতকরা সাড়ে পঁচাত্তর ভাগ।

১৯১৯ সালে ২৬শে ডিসেম্বর পিপ্‌ল্‌স্‌ কমিশারদের এক সভায় স্থির হল যে সমস্ত সোভিয়েট দেশ থেকে নিরক্ষরতার গ্লানি দূর করতে হবে। লেনিনের ডিক্রী জারী হল সাধারণের সামনে। তারপর শুরু হল শিক্ষার প্রসার। 'অশিক্ষার অন্ধকারে ঢাকা জনসমাজকে জাগাও' —এই স্লোগান দিক থেকে দিকে বজ্র নির্ঘোষের মত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। বিপ্লবী মজুর-চাষীদের হাঁক গিয়ে পৌঁছল মানুষের কানে, যারা অক্ষর চিনতে শেখেনি তাদের কাছে—যারা পড়তে শিখেছে অথচ অক্ষর লিখতে জানে না তাদের কাছেও। দশ বছরের মধ্যেই বিরাট

পরিবর্তন চোখে পড়ল। ১৯২৯ সালে শতকরা ৫৮ ভাগ লোক শিক্ষিত হয়ে উঠল। এবার আর একটা যুগের প্রয়োজন হল না, মাত্র চার বছরের মধ্যেই ১৯৩২ সালে শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যা অক্ষর চিনতে শিখল, নিজের মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শিখল।

মাত্র বারো বছরের মধ্যে অশিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ জনতাকে কী করে শিক্ষিত করে তোলা হল এ সত্যিই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর এইজন্যে যে এক পক্ষের প্রচেষ্টার দ্বারা এ কাজ কখনই সম্ভব নয়। কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত রাষ্ট্রের শিক্ষা দেওয়ার অভিযানের সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছু মনের মিলন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই দুইয়ের মিলন কী করে সম্ভব হল? এর উত্তর মিলবে মার্কস্‌বাদে। এর উত্তর মিলবে মার্কসবাদী জীবনদর্শনের প্রতিফলনে।

সোভিয়েট সরকার শুধু মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিতদের শিক্ষা দেওয়ার কাজেই ব্যস্ত রইল না, আগামী সমাজের কর্ণধার যে ভবিষ্যৎ বংশ—সেই শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার দিকেও বেশ কিছুটা দৃষ্টি দিল। শিশু-সদন, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক স্কুল, চিলড্রেন্‌স্‌ প্যালেস, রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, ক্লাব—সংস্কৃতি জগতে প্রবেশ করল ছেলেমেয়েরা যেন রূপ-কথার এক একটি নায়ক নায়িকা হয়ে।

মেয়েদের জীবনে সন্তান পালন করা একটা ভয়ানক পীড়াদায়ক কাজ। শুধু পীড়াদায়ক কাজই নয়, একটা বড় সমস্যাও বটে। সন্তান-পালন মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনকে কী ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে তা আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাবো। দেখতে পাবো তাদের নিজেদের সুখ-সুবিধা এবং ব্যক্তিত্ব সমস্তই সন্তানপালনের সমস্যার কাছে কত ছোট কত নগণ্য হয়ে গিয়েছে। তার সমগ্র জীবনকে ঘিরে আছে কেবল হাজার রকম গেরস্তালির কাজকর্ম, স্বামীর পরিচর্যা আর সন্তানপালন। এর বাইরে সে অনুপস্থিত। এর বাইরে তার অস্তিত্ব একটা প্রকান্ড শূণ্যতার মধ্যে বিলুপ্ত। এই সন্তানপালন ও শিক্ষাদীক্ষার মত বিরাট সামাজিক সমস্যাকেও অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে সমাধান করতে পেরেছে বলে সোভিয়েট সমাজ দাবী করতে পারে।

আজ প্রতিটি সোভিয়েট ছেলে-মেয়েকে কিন্ডারগার্টেনে যেতে হবে, স্কুলে পড়তে হবে, সোভিয়েট শিল্প, কৃষি বা রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে এ হল সমগ্র সোভিয়েট সমাজের দাবী। এ থেকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। যদি কেউ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সে সোভিয়েট নাগরিক হওয়ার অনুপযুক্ত, তাহলে সে হল সোভিয়েট ব্যবস্থার শত্রু—সোভিয়েট সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়।

শিশু-শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যেই সমস্ত শিক্ষা-আন্দোলন সমাপ্তি-লাভ করেনি। সমাজের আরও গভীর তলদেশে, আরও ব্যাপক বিস্তৃতি নিয়ে সোভিয়েট সংস্কৃতির প্রবাহ অগ্রসর হয়ে চলেছে। তার ব্যাপ্তি দেখা যায় শহরের ও গ্রামের হাজার হাজার ক্লাবের মধ্যে। ওদেশের ক্লাবগুলি নিছক আমোদ প্রমোদের জায়গাই নয়, ক্লাব হল সংস্কৃতির বড় বড় পীঠস্থান। ১৯১৪ সালে সমস্ত দেশে ক্লাবের মোট সংখ্যা ছিল ২২২টি। আর তখন কারা যেত সে সব ক্লাবে? জারের মোসাহেব, বড় বড় রাজকর্মচারী, বড় বড় খেতাবধারী খয়ের খাঁ-দের ছেলেমেয়ে, বড় লোক ও জমিদারদের পোষ্যপুত্র—এরাই ছিল তখনকার ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। গরীব মজুর-চাষীরা সেদিন শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকত ক্লাবগুলোর দিকে, তার ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে পারত না কেউ। কিন্তু সেই ক্লাবের সংখ্যা ১৯৩৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৯৫,৬২৬-এ। আজ কারা যায় সেই সব ক্লাবে? সেই সব লক্ষ লক্ষ মজুর চাষী যারা জারের সমাজে ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়, অস্পৃশ্য, ছোটলোক।

সোভিয়েট ক্লাবের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি আন্দোলন কী ভাবে অগ্রসর হচ্ছে তার খবর নেওয়া দরকার।

শিল্পাঞ্চলে, যৌথ খামারে, শহরে, জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী হাজার হাজার ক্লাব সমস্ত দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছে। কোথাও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোথাও শ্রমিক সংঘ ক্লাব, আবার কোথাও যৌথ খামার ক্লাব। এই সব ক্লাবে একটি করে অত্যন্ত সুসজ্জিত পাঠাগার আছে। এখানে এসে লোকে মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করে। নিজেদের দেশের নানা খবর, দেশ বিদেশের খবর, জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর আহরণ করে, আলোচনা করে—পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া-

নেওয়া করে। এই ক্লাবগুলি আবার শিল্প-কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেকগুলি চক্র পরিচালনা করে যেমন সংগীত চক্র, কবিতা চক্র, চিত্রকলা চক্র, জীববিদ্যা চক্র, প্রত্নতত্ত্ব চক্র, স্থাপত্যবিদ্যা চক্র, এমনি আরও অনেক। শুধু ক্লাবেই নয়, কলকারখানাতেও এমনি অনেক চক্র গড়ে উঠতে দেখা গেছে।

এই চক্রগুলি সোভিয়েটের সংস্কৃতি জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এবং এই চক্রগুলির মধ্যে যারা অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে তাদের মধ্যে মেয়েদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৩ সালের এক হিসাব থেকে জানা যায় যে তখনকার মোট চক্র-সভ্য সংখ্যা ২১,৭৯,০০০-এর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৯৭,০০০। তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে চক্রের মেয়েরা পুরুষদের প্রায় সমান সমান। সোভিয়েট দেশ থেকে নিয়মিতভাবে প্রায় চার হাজার দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই সব পত্রিকার সংবাদদাতা ও সাংবাদিক হিসাবে মেয়েদের দান কিছু সামান্য নয়। সতের বছর আগেকার কথা—সে সময়েই সংবাদদাতা ও সাংবাদিকদের শতকরা প্রায় তের ভাগ ছিল মেয়ে। আজ অবিশ্যি তার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ সেদিনের তুলনায় মেয়েরা আজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির দরবারে এক বিশেষ আসন পাবার দাবী রাখে।

১৯৩৬ সালে মেয়েদের সম্পর্কে এক অত্যন্ত কৌতূহলজনক অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। সেই অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে মেয়েরা গড়ে প্রতি মাসে প্রায় চার বার সিনেমা, থিয়েটার, কনসার্ট, যাদুঘর ইত্যাদিতে গিয়ে থাকে। জারের আমলে অধিকাংশ মেয়েই বাড়ীর বার হতো না, যারা হতো তারা ক্বচিৎই এমনি ঘন ঘন আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠানে যোগ দিত। আজ সেখানে পুরুষদের মত মেয়েরাও সমানভাবে সিনেমা, থিয়েটার কনসার্ট ইত্যাদিতে আগ্রহ নেয়।

সাহিত্য সম্বন্ধে তারা কি পরিমাণ আগ্রহ নেয় শুনলে অবাক হতে হয়। সেই বছরেই হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে এক যন্ত্র-নির্মাণ কারখানার

মেয়েকর্মীদের মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ পুশকিনের "ইউজিন অনেজিন" ও গোর্কীর "মাদার" বই দুটি পড়েছে, ৫১ ভাগ পড়েছে গোগলের "ডেড সোল্স্", ৫৫ ভাগ পড়েছে শোলোকভের "ভার্জিন সয়েল আপটার্নড্" এবং শতকরা ৬৭ ভাগ গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেছে কমরেড স্টালিনের সপ্তদশ কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের অভি-ভাষণ। বিপ্লবের আগে যে নারীজাতির সাহিত্য-জগতে (প্রাচীন সাহিত্যই হোক বা আধুনিক সাহিত্যই হোক) প্রবেশের কোন অধিকার ছিল না—অশিক্ষার অন্ধকারে তলিয়ে ছিল যে বিরাট্ নারীসমাজ, তারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উচ্চশীর্ষে উঠল কী করে? এই উন্নতি বাস্ত-বিকই চমক লাগায়।

কৃষি জগতে মেয়েদের অস্বাভাবিক সাংস্কৃতিক উন্নতি সত্যি সত্যিই আরো বেশী করে নজরে পড়ে। কারণ আগে অন্তঃপুরে বন্দী ছিল মেয়েরা। তাদের জীবনে 'ঘর'ই ছিল একমাত্র সত্য। তার বাইরে নিজেদের কথা ভাবতে পারতো না তারা। দেশ বিদেশে কি ঘটছে, দেশের রাজনীতি কোন্ পথে চলেছে, সমাজ কোন্ দিকে মোড় ফিরছে, দেশের কোটি কোটি মানুষ কী ভাবছে, বিজ্ঞান জগতে কি কি নতুন আবিষ্ক্রিয়া দেখা দিচ্ছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাত না তারা। খবরের কাগজ ছিল তাদের কাছে বিলাসিতা। আবার অধিকাংশ মেয়েরা কাগজের অক্ষরই চিনতো না। আজ কিন্তু ঘরের বাইরে এসে তারা সমাজকে চিনেছে, জীবনে সমাজতন্ত্রবাদের বৈপ্লবিক আস্বাদ পেয়েছে। তাই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তারা অগ্রসর সমাজের প্রাণস্পন্দন উপলব্ধি করতে পারে।

শ্রমিক সংঘ ও যৌথ খামার কর্মীদের সংগঠন পরিচালনার কাজেও সোভিয়েটের মেয়েরা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। প্রত্যেকটি কলকারখানায়, প্রত্যেকটি শ্রমশিল্পে সক্রিয় ও সচেতন মেয়েরা হাজার হাজার মেয়েদের শ্রমিক সংঘে টেনে এনেছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরি-বর্তন ঘটিয়েছে, তাদের দেখিয়েছে সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা তাদের জীবনে কি সম্ভাবনা, কি সম্পদ নিয়ে আসছে! তেমনি গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার পিছিয়ে-থাকা মেয়েদের জীবনে তারা এক নতুন বার্তা

উপস্থিত করেছে.........যৌথ খামারের কাজে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করেছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিই আজ সারা সোভিয়েট দেশকে জনসাধারণের কল্যাণে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার মোট সভ্য সংখ্যা হল ৬৩ লক্ষ। তার মধ্যে মেয়েরা হল ১০ লক্ষেরও ওপর।

সোভিয়েটের সামাজিক ও সাংকৃতিক অগ্রগতি থেকে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে ধরা পড়ে যে সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর আজ আর কারো এক-চেটে অধিকার নেই। সংস্কৃতির সম্পদ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। একজন রাশিয়ান, তাতার, আর্মেনিয়ান, শ্বেত রুশ, ভল্গার জার্মান, কি উজবেক—কারো মধ্যে এতটুকু অসামঞ্জস্য নেই। তারা প্রত্যেকেই বলতে পারে যে—এ আমার দেশ, একে ইচ্ছেমত গড়ে তোলার স্বাধীনতা আমার আছে এবং তাতে সোভিয়েট দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ সায় দিয়ে বলবে "নিশ্চয়ই, সে স্বাধীনতা তোমার আছে—তোমার এবং আমার। আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থ আজ আর পরস্পরবিরোধী নয়। এই সংস্কৃতি আজ আর লক্ষ্মীর তথাকথিত বরপুত্রদের হাতে বিলাসের সামগ্রী হয়ে নেই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন আলোয় আমাদের সমস্ত দেশ আজ উদ্ভাসিত।"

এ কথা ওরা বলতে পারে। বলতে পারে তাস্খেন্তের মজুর আর জর্জিয়ার চাষী। কারণ ওরা জানে যে কারো লুট করা সম্পদ দিয়ে আলো জ্বলেনি ওদের দেশে। ওদের আলো ওদের নিজেদের সৃষ্টি।

জাতীয় রিপাবলিকের মেয়েরা

নানা জাতির মানুষ নিয়ে সোভিয়েট দেশের জনসংখ্যা। একশো নব্বুই রকম ছোট বড় জাতি সমান অধিকারের ভিত্তিতে ছড়িয়ে রয়েছে সারা দেশময়। এরাই হল সোভিয়েট সমাজের প্রাণ এবং তার সমাজতান্ত্রিক নীতির ধারক ও বাহক।

সোভিয়েটের নীতি যখন নারীমুক্তির বার্তা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল তখন তা কোন বিশেষ এলাকার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, সমস্ত দেশের ছোট বড় সকল অঞ্চলে গিয়ে পেঁচেছিল তার আলো। কোন জায়গায় অতি সহজে সেই স্বাধীনতার বাণী সমাদর লাভ করেছিল, আবার কোন কোন জায়গায় তুমুল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে। জারের রাজত্বে ছোট ছোট জাতিদের হাজার রকম শোষণ নির্বিবাদে সহ্য করতে হতো। তাদের প্রদেশ বা এলাকাগুলি ছিল জারের ঔপনিবেশিক শোষণের যাঁতা-কলের নীচে। যারা দরিদ্র জনসাধারণ তাদের ওপর ছিল দেশী ও বিদেশী দু-রকমের শোষণ.........একদিকে স্বদেশী বণিক, জমিদার ও মোল্লা, অন্য দিকে রুশীয় পুঁজিপতি।

তাদের চাপে ধ্বংস হতে বসেছিল এই জাতিগুলির অস্তিত্ব। অত্যন্ত নিম্নস্তরের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আবর্তে ডুবে ছিল এই বিরাট জনসমাজ। তাদের গোষ্ঠীপতি-প্রভাবান্বিত গোত্রীয় ও সামন্ত-তান্ত্রিক সামাজিক বিধিব্যবস্থার মধ্যেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এই সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির। মেয়েদের ওপর পুরুষদের ছিল অখণ্ড আধিপত্য; সামাজিক কাজকর্মে যোগ দেওয়ার তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছিল তাদের কাছে স্বপ্ন। স্বামীর কাছে স্ত্রী ছিল তার দাসীর মত... তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমতুল্য, বাইরের সমাজে তার গতিবিধি ছিল নিষিদ্ধ। সারা দিন সাংসারিক কাজ, স্বামীর পরিচর্যা ও সন্তান সৃষ্টি —এই ছিল জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য।

বহু শতাব্দী আগে (দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে) কিন্তু ঠিক উল্টো ছিল এই সমাজের অবস্থা; মেয়েরাই ছিল সমাজের কর্ত্রী। মধ্য এশিয়ার অনেক বড় বড় এলাকা ছিল মেয়ে-খানদের শাসনের অধীনে। চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণের সময়ে দেখা গেছে যে মেয়েরা বীরত্বের সঙ্গে সেই দস্যু-সৈন্যদলের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে। সেদিন উচ্চশীর্ষে ছিল তাদের স্থান।

মধ্য এশিয়া, ক্রাইমিয়া, ককেশাস, ট্রান্স-ককেশিয়া ও অন্যান্য মুসলমান সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিগুলি জারের আমলে বিশেষ করে এক নিদারুণ নির্যাতনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করত। তাদের ধার্মিক ও লৌকিক সংস্কারবদ্ধ সমাজ মেয়েদের সমস্ত দায়িত্ব পরিবারের কর্তার ওপরই অর্পণ করেছিল। যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গিয়াছিল চরমতম নারী-নির্যাতনে।

তাদের সামাজিক বিধি অনুসারে কোন স্ত্রী স্বামীর ও বাড়ীর কর্তৃ-স্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া কারও সঙ্গে বাইরে বেরুতে পারতো না; নিষিদ্ধ ছিল পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা, বোরখা না পরে রাস্তায় চলা ছিল বিধি-বহির্ভূত। নয় বা দশ বছর পার হলেই প্রত্যেক মেয়েকে পারাঞ্জা (মাথা থেকে পা পর্যন্ত দীর্ঘ আবরণ) পরতে হতো। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই আবরণ অঙ্গে ধারণ করাই ছিল সামাজিক বিধি। উজবেক এবং তাজিক মেয়েদের আট-নয় বছর বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো এবং যে কোন পাত্রই অর্থের বিনিময়ে মেয়ে খরিদ করে তার মালিকানা স্বত্বের অধি-কারী হতে পারত।

কিন্তু নতুন যুগ পত্তনের পর উক্ত জার-শাসিত উপনিবেশের সমস্ত ছোট ছোট জাতিগুলিকে সোভিয়েট রাষ্ট্র সমস্ত রকম অন্যায় ও অসঙ্গতি থেকে মুক্তি দিল। শুধু মুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত হল না, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প ও কৃষিগত উন্নতির সাহায্যে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিকে স্বাবলম্বী ও সম্ভাবনাপূর্ণ করে তোলার দিকে নজর দিল। সোভিয়ে-টের ইউরোপীয় অংশে যে সব বাধাবিঘ্ন আদৌ দেখা দেয়নি বা অল্প পরিমাণে দেখা দিয়েছিল সেগুলি ব্যাপক আকারে দেখা দিল এই জাতীয় রিপাব্লিকগুলিতে। কারণ এই সব জাতির মেয়েরা ছিল অশিক্ষিত,

কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল। তাই আইনের সাহায্য তাদের চিরাচরিত রীতিনীতি উচ্ছেদ করে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে হল। জনসাধারণের কর্তৃত্ব কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলক বিবাহ, গৌরীদান প্রথা, বলপূর্বক বিবাহ, মেয়ে-বিক্রী প্রথা আইনতঃ উচ্ছেদ করে ষোলো বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার আইনসঙ্গত বয়স স্থিরীকৃত হল। খোলা হল মেয়েদের ক্লাব (সেখানে তখন পুরুষদের যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল) এবং এই ক্লাবগুলিতে বসল নানা বয়সী মেয়েদের জটলা; তাদের হাতের কাজ প্রদর্শিত হল সেখানে, নানা বিষয়ের ওপর নিয়মিতভাবে শিক্ষা পেতে থাকলো সবাই। ধীরে ধীরে এই ক্লাবগুলিই হয়ে উঠলো হাতের কাজের সমবায় ভাণ্ডার। এই ক্লাব থেকেই মেয়েরা নিজেদের পরিশ্রমে একটা কারখানা গড়ে তুলল—সেই সব মেয়েরা যারা আগের দিনে ছিল হারেমের বন্দিনী। নারী আন্দোলনে এক নতুন স্রোত চোখে পড়ল। সবখানে যেন কর্মচাঞ্চল্যের ভাব। একমাত্র আজারবাইজান রিপাব্‌লিকেই ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত হল এক হাজার ছয়শো মহিলা সভা ও বিশটি মহিলা সম্মেলন। জর্জিয়ায় হল দু হাজার সভা, তেইশটি সম্মেলন।

রক্ষণশীল মুসলিম সামাজিক প্রথা যা এতদিন সমস্ত নারীসমাজকে তার নাগপাশে বেঁধে রেখেছিল, নতুন যুগের প্রবর্তনে তা ভঙ্গুর হয়ে এল। তারপর এল প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যা এই নড়বড়ে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে কঠিন জমিনের ওপর স্থাপন করল। শিল্প ও কৃষি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দরকার হয়ে পড়ল নতুন কর্মীর। মেয়েদের সামনে কর্মজগতের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বিভিন্ন কলকারখানায় যে সব শ্রমজীবীরা অংশ গ্রহণ করল তার মধ্যে কোথাও শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ, কোথাও ত্রিশ ভাগ হল মেয়ে-শ্রমিক। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এদের স্থান ছিল হারেমে...মেষপালন ও জীর্ণ কৃষিকর্ম ছিল এদের সমাজের রূপ। আমীর, খান, বে, মোল্লা, ইমাম, সুফি......মধ্য এশিয়ার বুক থেকে এদের কলঙ্কময় শোষণের দাপট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ধীরে ধীরে। এক সামাজিক বিপ্লব সমস্ত সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে তৈরী করতে

অগ্রসর হল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জারের যুগে রাশিয়ায় অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা সত্তর ভাগ কিন্তু এই সব নির্যাতিত জাতিগুলির মধ্যে নিরক্ষরতা ছিল আরও অনেক বেশী, যেমন তাতারদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮২ জন, শ্বেত রুশদের মধ্যে প্রায় ৮৯ জন, চুভাসদের মধ্যে ৯৪½ জন, কাবারডিনোদের মধ্যে ৯৬½ জন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ছিল আরও কম......প্রায় ছিল না বললেই চলে। কোথাও একশো ভাগের এক ভাগের এক-তৃতীয়াংশ, কোথাও বা এক-পঞ্চমাংশ—এই ছিল স্ত্রী শিক্ষার প্রসার।

আজ আর সেদিন নেই। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে সমস্ত জাতীয় রিপাবলিকগুলি। খুব ছোট ছোট জাতি যেমন ইনগুসটিয়া, চুভাস, আদিজিয়া যাদের মধ্যে শিক্ষা ছিল না এতোটুকু তারা আজ পুরোপুরি শিক্ষিত, সভ্য, সংস্কৃত। মেয়েদের মধ্যে সবাই লিখতে পড়তে শিখেছে...কয়েক বছর আগে পর্যন্ত যারা শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করত না।

তুর্কমেনিস্তান, কাজাকস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আজারবাইজান—মধ্য এশিয়ার এই সব জাতীয় রিপাবলিকগুলি যেমনভাবে দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তেমনিভাবে উন্নত, স্বাবলম্বী ও সুসভ্য হয়ে উঠেছে সে সব দেশের লোকগুলি। সে সব দেশে কলকারখানা বসেছে, হাজার হাজার যৌথ খামার গড়ে উঠেছে, বৈদ্যুতিক স্টেশন, যানবাহন, রেল-লাইন, এরোপ্লেন, সভ্য সমাজের সব রকম সুখ সুবিধা সমস্ত দেশবাসীর জীবনে এক নতুন সভ্যতার ভিত গেঁথেছে। এই নতুন সভ্যতার স্পর্শ থেকে মেয়েরা বাদ যায়নি। যাদুর মত এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তারাও নিজেদের নতুন সমাজের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছে।

সোভিয়েট মধ্য এশিয়া তুলোর জন্যে বিখ্যাত। ওদেশের অপর্যাপ্ত তুলোর ফসলকে লোকে বলে 'সাদা সোনা'। আগের দিনে এই তুলোর ফসলের সমস্তটাই জার সরকার নিয়ে যেত নিজের দেশে এবং রাশিয়ার সুতোকলে কাপড় তৈরী হতো এই তুলো দিয়ে। কিন্তু আজ

সোভিয়েট এশিয়াতেই রেশম ফ্যাক্টরী, কাপড় কল, কার্পাস কর্মশালা গড়ে উঠেছে...গড়ে উঠেছে সাধারণ ভোজনাগার, শিক্ষালয়, ডাক্তারখানা, ফ্যাক্টরী ক্লাব। তাই আর ঘরের কোণে আলাদা হয়ে বসে থাকতে পারেনি মেয়েরা; সমাজের কর্মমুখর জীবনে এসে নিজেদের দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। কলকারখানায় যোগ দিয়ে তাদের সমাজ-সচেতন মন এক অভিনব আস্বাদ পেয়েছে......সবাই মিলে বৃহত্তর সমাজের জন্যে শিল্প উৎপাদনের এক অভিনব আস্বাদ...যে আস্বাদ তাদের উত্তরোত্তর আরও কর্মনিষ্ঠ আরও সমাজমুখী করে তুলেছে। বাড়ীর রক্ষণশীল অভিভাবক বা স্বামীরা চাইতো না যে তাদের বোন, মেয়ে বা স্ত্রী কলকারখানায় কাজ করুক বা পুরুষদের সংগে সমানতালে পাল্লা দিক। কিন্তু সে সব লোক পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে যে তার সন্দেহ ভিত্তিহীন...ঘরের বাইরে বেরিয়ে কোন মেয়েই ভুল পথে যায়নি, বরং অর্থোপায় করে এনেছে, পরিবারের অর্থ বৃদ্ধি করেছে; দৈনন্দিন জীবনে বিকাশ লাভ করেছে সুখ ও সমৃদ্ধি।

আধা-বর্বর মানুষ এমনি করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন সভ্যতার অধিকারী হল। আটত্রিশটি ছোট ছোট জাতি যাদের কোন বর্ণমালা ছিল না, সোভিয়েট শাসনে তাদের প্রত্যেকের জন্যে বর্ণমালা তৈরী হল। আজ সেই আটত্রিশটি জাতি তাদের নিজেদের বর্ণমালায় নিজেদের ব্যক্ত করে, প্রতিফলিত করে।

মধ্য যুগের অশিক্ষিত মানুষের কাছে সংস্কৃতি নিয়ে এল এক বিস্ময়। বইয়ের পাতায় পাতায় অক্ষরের সমুদ্রের মধ্যে তারা এক নতুন কৌতুক, নতুন দীপ্তি খুঁজে পেল, যা এতদিন চাপা পড়েছিল নিতান্ত বর্বর জীবনযাত্রার আড়ালে। কারখানার ক্লাবে ক্লাবে, গ্রামের কুঁড়ে-ঘরের চালায় চালায় পাঠাগার বসল, মানুষ জমলো দলে দলে—ছেঁড়া নোংরা কাপড় পরা দাড়ীওলা মুসলমান চাষী, কারখানা ও সমবায় ভাণ্ডারের মুসলমান মজুর—তাদের চোখে মুখে অপরিমেয় কৌতূহল, হালবদলে-যাওয়া দুনিয়ার দিকে তাকাবার কেমন একটা অপ্রতিরোধ্য উলংগ দৃষ্টি। পারাঞ্জা-ঢাকা এবং পারাঞ্জা-খোলা মেয়েরাও এসে জটলা

করল পাঠাগারের চার পাশে। গ্রামের কুঁড়ে-ঘরে এমনি আলোর বিস্ফার! মেয়েদের দু চোখে শানিত বিস্ময়!

শুধুমাত্র বিপ্লবের পরই নয়, আজও গ্রামে গ্রামে চাষীর কুটিরে পাঠাগার শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে বিরাজ করছে। কি ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই পাঠাগারের সংখ্যা তা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। এখানে তার একটা হিসাব দিলামঃ

	১৯২৮-২৯	১৯৩৩-৩৪
ট্রান্স-ককেশাস	৮০১	১,৪০৭
উজবেকিস্তান	৫৫৪	৩,৪৭১
তুর্কমেনিস্তান	৭৭	২৪৮
তাজিকিস্তান	২১	৩১৭

এই সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ ক্রম-সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি কি পরিমাণ এগিয়ে চলেছে তা আপনা থেকেই বোঝা যায়। বোঝা যায় কয়েক বছর আগে যে জাতির বর্ণমালা ছিল না সে জাতির কাছে এই মর্যাদা কত গভীর, কত ব্যাপক।

নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মেয়েরা বর্তমান যুগের বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন হল। সাবান ব্যবহার করতে শিখল তারা, কাপড়ের নীচে অন্তর্বাস পরার প্রয়োজন অনুভব করল, বিছানা ও আসবাবপত্র তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য হল...বিজলী বাতি পেল তারা তাদের হাতের নাগালে। সঙ্গে সঙ্গে পেল স্বামী-নির্বাচন ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার।

অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে এক লাফে তারা চলে এল বিংশ শতাব্দীর সোভিয়েট সমাজের আওতায়। বারো বছর বয়স হলেই পারাঞ্জার আড়ালে ঢাকা পড়ত যাদের জীবন, পরিবারের প্রত্যেকটি পুরুষ মানুষের পা ধোয়াই ছিল যাদের জীবনের ব্রত, পরিবারের প্রত্যেকটি বাড়ীর খুদ-কুঁড়ো দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হতো যাদের তারা আজ স্বামীর পাশাপাশি বসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে...তারই পাশে হয়ত পড়ে আরেকটি মেয়ে যার মা হয়তো সারা জীবন কাটিয়েছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে—মাটির ওপর শুয়ে, কোন দিন সমাজের ভয়ে স্বামীর নাম

পর্যন্ত মুখে আনতে পারেনি।

মধ্য এশিয়ার কলঙ্কময় অতীত বর্তমানের উজ্জ্বলতায় মুছে গেছে—মুছে গেছে জার, আমীর, খান, বে ও মোল্লাদের কালো শাসনের কাহিনী। একজন উজবেক মেয়ে আজ তার মার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে "পারাঞ্জা কাকে বলে বলতে পারো মা?" মা অতীতের দিকে তাকায়, তারপর থেমে থেমে নতুন আগ্রহ নিয়ে পারাঞ্জার গল্প বলে মেয়েকে—যেন সাত সমুদ্দুর তের নদী পারের রূপকথার কাহিনী বলছে।

সোভিয়েটের নারীমুক্তির কাহিনী এমনি কৌতূহলজনক, এমনি রোমাঞ্চকর। পর পর আটটি অধ্যায়ে সোভিয়েটের মেয়েদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা থেকেই তার দূরপ্রসারী বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল পরিচয় মেলে।

অনেক দেশেই স্ত্রী-স্বাধীনতা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে শহুরে মেয়েদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতার ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছে উগ্র আধুনিকতা কিন্তু তাতে করে নারী সাধারণের সামগ্রিক স্বাধীনতা আসেনি। পাশ্চাত্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে যা পরিচিত তা হল অর্থশালী বণিক ও তার অনুবর্তী শ্রেণীর সামাজিক ব্যাধি—উগ্র আধুনিকতার নামে নারী জাতিকে শোষণের বৃত্তের মধ্যে আটক করে রাখার নতুন কায়দা। ভারতবর্ষের মত দেশকে না হয় বাদই দেওয়া গেল, কিন্তু অন্যান্য বড় বড় দেশ থেকে কোন অনুপ্রেরণা মেলে কি? সেখানেও মেয়েদের ওপর সেই সামাজিক শোষণ, পুরুষদের অপ্রতিহত অধিকার, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা (যেটুকু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে জনসংখ্যার তুলনায় সে আর কতটুকু!), রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নিদারুণ অবজ্ঞা; ব্যক্তিগত জীবনে সেই হতাশা, লাঞ্ছনা, সংগ্রাম ও দারিদ্র্য। কারণ সেখানকার পুরুষ কিংবা নারী কারো চোখেই সমাজ, অর্থনীতি বা রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও রূপ এতটুকু পালটায়নি। বিত্তশালী ও বিত্তহীনের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম, দেশের পঁচানব্বুই ভাগ জনসাধারণ সর্বহারা শ্রমিক ও নিঃস্ব কৃষকের ওপর সমাজের পাঁচভাগ শোষকের

নির্যাতন, অসমান ধনবণ্টনপ্রণালী, পাশাপাশি প্রাচুর্য ও দুর্ভিক্ষের অবস্থান—এ সমাজে নারীমুক্তির কথা কল্পনা করা হাস্যকর। এ সমাজে পাশ্চাত্ত্য-মার্কা মুক্তি মিলতে পারে কিন্তু সোভিয়েট সমাজ যে দূর-প্রসারী সামগ্রিক মুক্তির কথা বলে সেই মুক্তি বর্তমান সমাজকে জিইয়ে রেখে পাওয়া অসম্ভব।

সুতরাং সোভিয়েটের মেয়েদের স্বাধীনতার কথা পুরোপুরি বুঝতে হলে, আমাদের সমস্ত সোভিয়েট সমাজকে বুঝতে হবে কারণ যে ভিত্তির ওপর সেখানকার মেয়েরা তাদের এমনি সুখী ও সম্পৎশালী জীবন গড়ে তুলেছে, সে ভিত্তি অনেক মজবুত, অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ মৌলিক।

ENGRAVED AND PRINTED BY
REPRODUCTION SYNDICATE, CAL.